॥ নয় ॥

পরবর্তী বাংলা নাটকে দীনবন্ধুর প্রভাব

॥ ১ ॥

জীবনের প্রতিরূপ (**illusion of reality**) সৃষ্টি করা নাট্যকারের মুখ্য ও পবিত্রতম কর্তব্য বলে পরিগণিত। জীবনের সত্য-স্বরূপকে যিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, তিনিই পারেন জীবনের প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে। জীবনের প্রতি আগ্রহ (আসক্তি) ও সহানুভূতির যোগেই এই উপলব্ধি সম্ভব। বহু-ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও সর্বব্যাপী সহানুভূতির বলে দীনবন্ধু মিত্র এই দুর্লভ জীবন উপলব্ধির ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর এই জীবনদর্শন কোন মতবাদ বা নিজস্ব কোন প্রাক্-ধারণার দ্বারা রঞ্জিত ছিল না। ফলে, জীবনের ভাল-মন্দ, আলো-আঁধার সবকিছুই তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন। শুধু যে দেখেছেন তাও নয়, জীবনের সুন্দর ও মঙ্গলের প্রতি তাঁর যেমন আকর্ষণ ছিল, তেমনি অসুন্দর ও অমঙ্গলের প্রতিও ছিল না কোন বিদ্বেষ। অন্ধকারের বক্ষভেদ করেই যে আলোর বিকাশ হয়, তার মধ্যেও যে মনুষ্যত্বের ইঙ্গিত ও কল্যাণকর উপাদান সংযুক্ত থাকতে পারে, একথা দীনবন্ধুর অজানা ছিল না।

উদ্ভবযুগেই দীনবন্ধু বাংলা নাটকের ক্ষীণধারায় প্রবল বেগ এবং প্রভূত শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত যে কয়টি নাটক রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রামনারায়ণের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' এবং উমেশচন্দ্রের 'বিধবা বিবাহ' উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক। যদিও 'কুলীন-কুলসর্বস্ব'র মধ্যে নাট্যলক্ষণ অপেক্ষা নক্সার বৈশিষ্ট্যই সুপ্রকট। উমেশচন্দ্রের আঙ্গিক সংস্কৃতানুগ।

রামনারায়ণ এবং উমেশচন্দ্রের এদুটি নাটক সমকালের কোন কোন লেখককে সামাজিক বিষয়ে নাট্যরচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। এদের মধ্যে রামনারায়ণ বা উমেশ মিত্রের অন্ধ অনুকরণ প্রচেষ্টা ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য মৌলিকত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না।

বাংলা নাটকে মধুসূদনের আবির্ভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলা নাটকের আঙ্গিক বিষয়ে তাঁর প্রদর্শিত পথই পরবর্তী কালে বাংলা নাটকের আদর্শ হিসেবে গৃহীত হল। কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শর্মিষ্ঠা' এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত

'পদ্মাবতী' নাটক দুটির বিষয় মূলতঃ পৌরাণিক। একছরই তিনি দুটি প্রহসন রচনা করেন। সামাজিক বিষয় নিয়ে এই তাঁর প্রথম ও শেষ নাট্যপ্রয়াস। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বিষয় রাজস্থানের ইতিহাস। আঙ্গিক বিষয়ে পরবর্তী বাংলা নাটকে মধুসূদনের প্রভাব যেমন উল্লেখযোগ্য, একমাত্র প্রহসন দুটি ছাড়া, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তিনি তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।

পৌরাণিক ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদে বাঙালীর নবলব্ধ নাট্যপিপাসা তৃপ্তি লাভ করেনি। প্রথাসিদ্ধ পৌরাণিক বিষয় যখন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যুগোপযোগী চিন্তার আলোকে নতুনভাবে বিশ্লেষিত ও উপস্থাপিত হল তখন এই বিষয়ও নাট্যরসিকের রসপিপাসাকে কিছু পরিমাণে তৃপ্ত করেছিল। তবুও সামাজিক বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল অনেক বেশী। পারলৌকিকতা নয়, ইহলৌকিকতাই নবযুগের জীবনভাবনা। একারণেই পৌরাণিক ঘটনা শুধুই দেবমাহাত্ম্যমূলক বলে তার আকর্ষণ ক্ষীণ হতে শুরু করল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই সামাজিক বিষয় অবলম্বনে যেসব নক্সা, ব্যঙ্গাত্মক রচনা বা প্রহসন রচিত হয়েছিল, পাঠকমনে শুধু হাস্যরসাত্মক রচনা হিসেবেই এদের মূল্য ছিল না, পরন্তু সামাজিক বিষয় সম্পর্কে পাঠকদের কৌতূহল কিছু পরিমাণে নিরসন করতে পারত বলেই এগুলির জনপ্রিয়তা সম্ভব হয়েছিল। বাঙালীর রস-পিপাসা পরিতৃপ্ত করতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা তাই কম উল্লেখযোগ্য নয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই সংঘটিত নানাবিধ সংস্কার আন্দোলনগুলি এই জীবন-জিজ্ঞাসাকে উত্তরোত্তর বাড়িয়েই চলেছিল। নক্সাধর্মী হলেও একারণেই 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' অতি সহজেই জনচিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত 'বিধবা বিবাহ' নাটকও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'আলালের ঘরের দুলাল' জীবনাশ্রয়ী হলেও অতি আদর্শবাদ এই উপন্যাসের বাস্তবতাকে আচ্ছন্ন করেছে।

এসময় এমন একজন লেখক অপেক্ষিত ছিলেন, যিনি বাস্তবরসপিপাসু পাঠকগণকে জীবনের সত্যচিত্র উপহার দিতে পারবেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'নীলদর্পণে'র প্রকাশ নানাকারণে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বৃহত্তর বাঙালী জীবনের এক সর্বজনীন সমস্যার মর্মান্তিক আলেখ্য এ নাটক। অখ্যাত জনের নির্বাক মনের মর্মের বেদনাকে উদ্ধারিত করবার ক্ষমতায় দীনবন্ধু সেদিন সকলকেই বিস্মিত, পুলকিত করেছিলেন। দীনবন্ধু মধুসূদন প্রদর্শিত পথেই নাট্যরচনায় অগ্রণী হয়েছিলেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, উদ্ভবযুগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কালে

দীনবন্ধুর মত নাট্যকার মধুসূদন-প্রবর্তিত আঙ্গিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করায় এই রীতিই পরবর্তী কালে বাংলা নাটকের আদর্শ হিসেবে সহজেই গৃহীত হয়েছিল। দীনবন্ধুর কৃতিত্ব শুধু বাস্তব ঘটনার যথাযথ রূপায়ণ ক্ষমতাতেই নিবদ্ধ নয়, তাঁর বহু ব্যাপক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশেছিল সর্বব্যাপী সহানুভূতি। জীবনকে ভাল না বাসলে জীবনের অন্তর্লোকে প্রবেশ করা যায় না। দীনবন্ধুর নাটক প্রহসনে যে মানুষগুলি একে একে পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে, তারা শুধু তাদের বাহ্যরূপ নিয়েই উপস্থিত হয়নি, নাট্যকার তাদের মর্মস্থানটিকেও একই সঙ্গে আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন। সংস্কার বশতঃ যাকে পতিত, নষ্ট চরিত্র, ঘৃণার্হ বলে জানি, সেটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। সমুজ্জল না হলেও, তারই মধ্যে মনুষ্যত্বের আলোককণা যে অদৃশ্য নয়, দীনবন্ধু তাই আমাদের দেখিয়ে দিলেন। নবযুগের এই মানবতা (humanism) দীনবন্ধুর নাটকে বিশিষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই মানবতাকেই বঙ্কিমের ভাষায় বলা যায়—'মনুষ্যপ্রীতি'। এ সংসারে মানুষের কর্তব্য ও লক্ষ্য কি, এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—

> "প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার সঙ্গীত। অনন্তকাল এই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপরে যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।"

—এ কথা শুধু বঙ্কিমের নয়, একথা দীনবন্ধুরও কথা—একথা নবযুগের মর্মবাণী। এ বিষয়টি বুঝতে পারলেই সেদিন দীনবন্ধু কোন্ মন্ত্রে এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারা যাবে।

দীনবন্ধুর জনপ্রিয়তা সেকালের ছোটবড় সব নাট্যকারকেই কমবেশী আকৃষ্ট করেছিল। সামাজিক বিষয় অবলম্বন করে যাঁরা নাটক রচনায় অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই নূন্যাধিক পরিমাণে দীনবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রভাব শুধু বিষয়বস্তুতেই নয়, বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে, নাট্যাদর্শে, এমনকি নাটকবিশেষের নামকরণের ক্ষেত্রেও কার্যকরী হয়েছিল।

দীনবন্ধু খুব বেশী নাটক রচনা করেননি। ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি মাত্র সাতটি নাটক ও প্রহসন রচনা করেছিলেন। তাঁর শেষতম নাটক 'কমলে কামিনী' ছাড়া অন্যান্য ছটি নাটক-প্রহসনই কমবেশী পরিমাণে পরবর্তী নাট্যকারগণকে প্রভাবিত করেছিল। এই কটি নাটক রচনা করেই তিনি প্রভূত খ্যাতি এবং অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বস্তুত, দীনবন্ধু তখন

নাট্যকারগণের নিকট আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছেন। রামনারায়ণের মত নাট্যকারও তাঁর প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারলেন না। গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুকে নটগুরু রূপে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। দীনবন্ধুর জনপ্রিয়তা এবং তাঁর সাফল্য এমনই বহুব্যাপক ও সর্বাচ্ছাদক রূপ ধারণ করেছিল যে, তাঁর নাটকের গুণগুলির সঙ্গে সঙ্গে দোষ-ত্রুটিগুলিও অনেকে অনুকরণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'নীলদর্পণে'র বিষাদান্তক পরিণতি যতই অবাস্তব বা অতিনাটকীয় হোক না কেন, ছোট বড় অনেকেই সেদিন 'নীলদর্পণে'র অনুকরণে ট্র্যাজিক নাটক রচনায় প্রয়াসী ছিলেন। দীনবন্ধুর প্রভাব যে উনিশ শতকেই শেষ হয়েছে, তা নয়। সাম্প্রতিক কালের নবনাট্য আন্দোলনের প্রেরণাও এসেছিল মূলতঃ 'নীলদর্পণ' থেকেই। একালের কোন কোন নাট্যকার 'নীলদর্পণে'র আদর্শে লোকজীবনের ঘটনাকে আশ্রয় করে নাটক রচনা করেছেন। এই অনুকরণ বা অনুসরণ কতটা সাহিত্য গুণান্বিত এবং সার্থক হয়েছে, তা বিচার করা প্রয়োজন।

দীনবন্ধুর সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অনুসরণ বা অনুকরণ করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা কম বেশী সকলকেই ভোগ করতে হয়েছে। অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির মন্ত্রে দীনবন্ধু মানবের অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছিলেন, যদৃষ্ট জীবনের অমৃত রূপকে তিনি রূপায়িত করতে পেরেছিলেন। নিরাসক্তি ও নিস্পৃহতা না থাকলে এই জীবন-দৃষ্টির স্বচ্ছতা আসে না। ফলতঃ দীনবন্ধুকে যাঁরা অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে এই গুণগুলির অভাব ছিল বলেই তাঁরা দীনবন্ধুর সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশের কিছুকাল পর থেকেই 'নীলদর্পণে'র আদর্শে বাংলা সাহিত্যে দার্পণিক নাটক রচনার এক জোয়ার আসে। 'সাক্ষাৎদর্পণ' (১৮৭১), 'ভারতদর্পণ' (১৮৭২), 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩), 'পল্লীগ্রাম দর্পণ' (১৮৭৩), 'কেরাণী দর্পণ' (১৮৭৪), 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৪), 'জেলদর্পণ' (১৮৭৫), 'বঙ্গদর্পণ' (১৮৮৪), 'টাইটেলদর্পণ' (১৮৮৫), 'মিউনিসিপ্যাল দর্পণ' (১৮৯২) প্রভৃতি এই ধারার নাটক। দর্পণাখ্য হলেও এগুলি সবই এক আদর্শ অনুসরণ করে রচিত হয়নি। তথাপি মোটামুটি সমাজসমস্যার বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটন করার সাধারণ উদ্দেশ্যের সূত্রে এগুলির 'দার্পণিকতার' যা কিছু ঐক্য ও সার্থকতা। নামসাদৃশ্য ছাড়া 'নীলদর্পণে'র সঙ্গে এগুলির আর কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

আবার কোন কোন নাটকের ঘটনা পরিকল্পনায়, চরিত্র রূপায়ণে এমন কি সংলাপাংশে দীনবন্ধুর প্রভাব অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'জমিদার দর্পণ'

'চা-কর দর্পণ'—নাটকগুলিতে শুধু নামসাদৃশ্যই নয়, বিষয়বস্তু, চরিত্র এবং সংলাপেও দীনবন্ধুর প্রভাব আছে। দর্পণাখ্য এই কয়েকটি নাটক ছাড়া বিভিন্ন লেখকের অনেক নাটকেই দীনবন্ধুর সুস্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকে রামনারায়ণ গিরিশচন্দ্র থেকে সুরু করে সাম্প্রতিক কালের তুলসী লাহিড়ী, মনোরঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখ নাট্যকার পর্যন্ত এই প্রভাবের ধারা প্রবাহিত। এই প্রভাবের স্বরূপ দু'ভাবে নিরূপিত হতে পারে—১. প্রত্যেক নাটক বা নাট্যকারকে আলাদাভাবে ধরে সেই নাটক বা নাট্যকারের উপর দীনবন্ধুর প্রভাব নিরূপণ করা, এবং ২. দীনবন্ধুর এক একটি নাটক ধরে সেই নাটকের দ্বারা কোন্ কোন্ নাট্যকারের কোন্ কোন্ নাটক, নাটকের চরিত্র বা তার সংলাপ প্রভাবিত তা নিরূপণ করা। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনায় প্রথম পদ্ধতিটি যথোপযুক্ত বলে মনে করা যায় না। বরং দ্বিতীয় পদ্ধতিই এক্ষেত্রে অবলম্বনীয় মনে হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে দীনবন্ধুর এক একটি নাটকের দ্বারা পরবর্তী নাট্যকারগণের কোন্ কোন্ নাটক কিভাবে প্রভাবিত এবং সে প্রভাবের পরিণতি ও তার কারণ নির্ধারণ করবার চেষ্টা করব।

দীনবন্ধু উদ্ভবযুগের নাট্যকার। 'নীলদর্পণ' প্রকাশের মাত্র ৮ বছর আগে প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধুর আগে রামনারায়ণ এবং মধুসূদনই উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। মধুসূদনের নাট্যজীবন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দেই শেষ হয়। (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসেই 'কৃষ্ণকুমারী' লেখা শেষ হয়, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নাট্যজীবনের অবসান বলা যায়)

রামনারায়ণ এর পরেও বেশ কিছুকাল নাটক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। মনোমোহন, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি আর সকলেই দীনবন্ধুর উত্তরসূরী। রামনারায়ণ দীনবন্ধুর পূর্ববর্তী হলেও 'নবনাটক', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'উভয় সংকট'—নাটক ও প্রহসনগুলির প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৬৬, ১৮৬৫ এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটক বলতে দীনবন্ধুর নাটক প্রকাশিত হওয়ার পর যে সমস্ত নাটক রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে, তাকেই বুঝানো হয়েছে।

'নীলদর্পণ' দিয়েই আমাদের এই তুলনামূলক আলোচনা শুরু করা যাক। প্রকাশ কাল অনুসারে অন্যান্য নাটকগুলি পরপর গৃহীত হবে। দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনের মধ্যে পরবর্তী বাংলা নাটকে 'নীলদর্পণে'র প্রভাবই সবচেয়ে বেশী। 'নীলদর্পণে'র অনুকরণে 'দার্পণিক' বাংলা নাটক রচনার প্রচেষ্টার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই নাটকগুলি ছাড়া গিরিশচন্দ্র, মনোমোহন বা রামনারায়ণ

প্রমুখ নাট্যকারগণের নাটকে 'নীলদর্পণে'র প্রভাব কতখান কার্যকর হয়েছিল দেখা যাক।

॥ ২ ॥

রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে গিরিশচন্দ্র কয়েকটি সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু এই নাটকগুলি তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভার সহজ প্রেরণার ফসল নয়—একথা গিরিশচন্দ্র নিজেও স্বীকার করেছেন। গিরিশ প্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্য বস্তুমুখীনতা নয়, ভাবমুখীনতা। সমুচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় প্রত্যক্ষ জীবনের পঙ্কিল আবর্তে তিনি দৃষ্টি সঞ্চালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি তিনি সামাজিক বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করাকে 'নর্দমা ঘাঁটা' বলে অবজ্ঞার চোখে দেখেছেন। গিরিশচন্দ্র যে কয়টি সামাজিক নাটক রচনা করেছেন তাতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি সুগভীর সহানুভূতির সার্থক সম্মিলন না ঘটে তবে কোন নাট্যকারই সামাজিক নাটক রচনায় সার্থকতা লাভ করতে পারেন না। গিরিশচন্দ্রের অধ্যাত্মবোধই সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে দুরপনেয় বাধার সৃষ্টি করেছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে, জীবন শুধু সমস্যার কূটপাকেই আবদ্ধ নয়, এর একটা ভোগের দিক আছে। সেই ভোগের মধ্যে যে বিচিত্র রস ও সৌন্দর্য স্বতোৎসারিত সেই জীবনোপভোগের বিচিত্র রূপায়ণ থেকে গিরিশচন্দ্রের নাটক বঞ্চিত। সমাজ-জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাবকে গিরিশচন্দ্র ঢাকতে চেয়েছিলেন পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে। সামাজিক নাটক ও প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের উপর দীনবন্ধুর প্রভাব তাই ছিল অনিবার্য। সামাজিক নাটক, প্রহসন এমনকি রোমান্টিক নাট্য-সৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুকে অনুসরণ করলেও দীনবন্ধুর সার্থকতা তিনি অর্জন করতে পারেননি। প্রহসনের ক্ষেত্রে গিরিশপ্রতিভা মূলতঃ ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ, সমাজ জীবন সম্পর্কে দীনবন্ধুর যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও ভালোমন্দ নির্বিশেষে সকলশ্রেণীর মানুষের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি ছিল, গিরিশচন্দ্রের তা ছিল না। দীনবন্ধুর মত হাস্যরসবোধের অভাবও এই নাটকগুলির ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) গিরিশচন্দ্রের প্রথম ও প্রধান সামাজিক নাটক। এই নাটকে 'নীলদর্পণে'র প্রভাব অস্পষ্ট নয়। 'নীলদর্পণে'র কাহিনী ও আদর্শগত প্রভাব 'প্রফুল্ল' নাটকে বিভিন্নভাবে স্থান লাভকরেছে। অবশ্যএই নাটকে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

'স্বর্ণলতার' নাট্যরূপ 'সরলা'র প্রভাবও কম নয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তমীপূজার রাতে বাগবাজার এমেচার থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে নটরূপে গিরিশচন্দ্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ। এরপর বার ছয়েক তিনি একই চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ১৮৭৩ সনে দ্বিধাবিভক্ত ন্যাশনাল থিয়েটারের উত্তরার্ধের কর্ণধার গিরিশচন্দ্র এই নতুন ন্যাশনাল থিয়েটারে একাধিকবার 'নীলদর্পণ' অভিনয় করান, এবং নিজেও অভিনয় করেন। সুতরাং একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, দীনবন্ধুর নাটকের (বিশেষ করে 'নীলদর্পণ' এবং 'সধবার একাদশী') আঙ্গিক আশ্রয় করেই গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি রচনা করবার এক মানসিক সংস্কার বি কশিত হয়ে উঠেছিল। দীনবন্ধুর প্রতি গিরিশচন্দ্রের আন্তরিক শ্রদ্ধাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। গিরিশচন্দ্রের নাটকে দীনবন্ধুর প্রভাব খুব অল্প নয়। ইচ্ছায় হোক, বা অনিচ্ছায় হোক দীনবন্ধুর বিভিন্ন নাটকের কোন কোন ঘটনা বা চরিত্রের ছায়াপাত গিরিশচন্দ্রের নাটকে আশ্লিষ্ট হয়ে আছে।

'প্রফুল্ল' নাটকের আঙ্গিক পরিকল্পনা 'নীলদর্পণে'র অনুরূপ। নীলকর-বিষধর-দংশনে স্বরপুরের গোলক বসুর পরিবার বিধ্বস্ত হয়েছে, আর রমেশের পৈশাচিক গুণ্ডামিতায় যোগেশের সাজানো বাগান শুকিয়ে গিয়েছে। উভয় নাটকের জননী-চরিত্র-দ্বয় সমপ্রকৃতির। পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূগণের প্রতি বাৎসল্য ও স্নেহপ্রীতি সাবিত্রী ও উমাসুন্দরী চরিত্রদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য। নবীনমাধবের এক পুত্র বিপিন এবং যোগেশের পুত্র যাদবের চরিত্র পরিকল্পনায়ও আপাত সাদৃশ্য আছে। বিপিনকে পাদপ্রদীপের আলোয় দেখি না, কিন্তু যাদবকে গিরিশচন্দ্র নাটকের ঘটনাসংস্থাপনে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা দান করেছেন। সরলতা ও প্রফুল্ল প্রায় অনুরূপ। কিন্তু উভয় চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতি বিভিন্ন। সরলতা নবীনাযুবতী, সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণার সারল্য ও চাঞ্চল্য থাকলেও শিশুসুলভ আচরণ নেই। নবীন যৌবনের সিংহদ্বারে প্রবেশোন্মুখী সরলতার জাগতিক সকল ব্যাপারেই অপরিসীম কৌতূহল। সম্ভ্রান্ত বংশের এই মেয়েটি শ্বশুর বাড়ি এসে শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাসুর, জা, সর্বোপরি স্বামীর স্নেহ-প্রীতি ও ভালবাসা আপন চরিত্রবলে জয় করে নিয়েছে। শিক্ষা-রুচি এবং বুদ্ধির সমন্বয় লক্ষ্য করি এই চরিত্রে। স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় তার মন উন্মুখ হয়ে থাকলেও শ্বশুরের সমূহ বিপদে বিন্দুমাধবের আগমনের বিলম্বকে সহজভাবেই মেনে নেওয়ার মত মানসিক প্রস্তুতি ও শিক্ষা তার আছে। পরিবারের দুর্দিনে এই চপলা বধূটি নির্বাক হয়ে গেছে। সরলতার এই নীরবতার মধ্য দিয়েই বসুপরিবারের বেদনাটিকে যেন নাট্যকার স্পষ্ট করে তুলেছেন। পক্ষান্তরে প্রফুল্লকে দেখি সে প্রথমত শিশুসুলভ আচরণ করে।

যাদবের সঙ্গে প্রফুল্লর প্রকৃতিগত পার্থক্য খুবই অল্প। উমাসুন্দরীর কাশীযাত্রা প্রসঙ্গে প্রফুল্ল যে আচরণ করেছে তা নবীনা বালিকার উপযুক্ত। অথচ এই প্রফুল্লই নাটকের শেষাংকে পরিণত বুদ্ধি-সম্পন্না, আদর্শবাদিনী, বক্তৃতার যুক্তিতে ভীত মদন পাগলকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। একই নাটকের সংকীর্ণ কালসীমায় ('প্রফুল্ল' নাটকের ঘটনা ১৫ দিনের কম সময়ের মধ্যে সংঘটিত) প্রফুল্ল চরিত্রের এই রূপান্তর এই চরিত্রের সঙ্গতি (integrity of character) ক্ষুণ্ণ করেছে।

সৈরিন্ধ্রী ও জ্ঞানদা প্রায় একই রকম চরিত্র। সরলতার প্রতি সৈরিন্ধ্রীর স্নেহ এবং প্রফুল্লের প্রতি জ্ঞানদার স্নেহ অনুরূপ। নীলকর সাহেবদের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে রমেশের নিষ্ঠুরতার সাদৃশ্য কল্পনা করা যেতে পারে কিন্তু বিদেশী স্বার্থান্ধ নীলকরদের সঙ্গে সহোদর রমেশের নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতাকে একই বিন্দুতে স্থাপন করা দুরূহ।

নিরপরাধা স্ত্রী চরিত্রের হত্যার দ্বারা করুণরস সৃষ্টির চেষ্টা উভয় নাটকের বৈশিষ্ট্য। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সাবিত্রী সরলতাকে গলায় পা দিয়ে হত্যা করেছেন কিন্তু রমেশ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের বিঘ্ন স্বরূপ স্ত্রী প্রফুল্লকে ক্রুদ্ধ হয়ে গলাটিপে হত্যা করেছে। দুটি মৃত্যুই অস্বাভাবিক ও করুণরস সৃষ্টিতে ব্যর্থ।

বাংলা নাটকে 'নীলদর্পণে'ই সর্বপ্রথম একটি বিচারালয়ের দৃশ্য রচনা করা হয়েছে। উকিল মোক্তারদের অসাধুপ্রকৃতি এবং বিচারের নামে প্রহসনের যে দৃষ্টান্ত 'নীলদর্পণে' তুলে ধরা হয়েছে পরবর্তী অনেক বাংলা নাটককেই তা প্রভাবিত করেছিল। 'প্রফুল্ল' নাটকের একটি বিচার দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। 'নীলদর্পণে'র প্রভাব ছাড়াও এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কিছু কার্যকরী হয়েছিল বলে মনে হয়।

পরিণতি-পরিকল্পনার দিক থেকেও নাটক দুটি সমধর্মী। মৃত্যুর আধিক্য ও অস্বাভাবিক মৃত্যু ও হত্যা নাটকদুটির পরিণতিকে melo-dramatic করে তুলেছে। কিন্তু উভয় নাটকের Tragic effect সৃষ্টির ক্ষমতায় পার্থক্য আছে। নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য অভিসম্পাতের মত নীলকরের বিষদংশন বসু পরিবারকে ধ্বংস করেছে, যার উপর এদের কোন হাত ছিল না। শুধু বসু পরিবারই নয়, বাংলাদেশের একটি বৃহৎ জনসমাজ এই নীলকরের দ্বারা প্রপীড়িত। বসু পরিবারের সর্বনাশের একটা সর্বজনীনতা আছে, তাই পরিণাম রূপায়ণের দুর্বলতা সত্ত্বেও 'নীলদর্পণে'র মধ্যে Tragic effect আছে। কিন্তু 'প্রফুল্ল' নাটকের পরিণতি ভয়াবহ। যাদবকে হত্যা করবার প্রচেষ্টায় যে নৃশংসতা প্রকাশ পেয়েছে তা শুধু অমানবিকই নয়, নিতান্ত অস্বাভাবিক। illusion of reality যা নাটকের প্রাণস্বরূপ তা থেকে 'প্রফুল্ল' নাটক বঞ্চিত।

ছোটখাট আরও কয়েকটি বিষয়ে 'নীলদর্পণ' ও 'প্রফুল্ল' নাটকের তুলনা করা যেতে পারে যেমন, "কোম্পানীর রাজ্যে এত হচ্ছে যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তাহলে ঘরে ঘরে আশীর্বাদ করে আর লোকে ভাতার পুত নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করে"—জ্ঞানদার এই উক্তির সঙ্গে ১/৪ গর্ভাঙ্কে নীলকর সম্পর্কে সাবিত্রীর উক্তির ভাবগত সাদৃশ্য আছে। সাবিত্রী : "মগের মুল্লুক আর কি ! ইংরেজের রাজ্যে কেউ নাকি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।" 'নীলদর্পণে'র ৩/৩ গর্ভাঙ্কে রোগ সাহেব কর্তৃক ক্ষেত্রমণির লাঞ্ছনার দৃশ্য ও চরম মুহূর্তে নবীনমাধবের আগমন ও ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করবার ঘটনার সঙ্গে 'প্রফুল্ল' নাটকের ৫/৪ গর্ভাঙ্কে যাদবের হত্যাদৃশ্য ও চরম মুহূর্তে প্রফুল্লের অকুস্থলে আগমন ও যাদবকে রক্ষা করার মধ্যে ঘটনার পরিকল্পনাগত সাদৃশ্য আছে।

ক্ষেত্রমণির লাঞ্ছনা ও নবীনমাধব কর্তৃক তার উদ্ধার—এই মহৎ ভাবের দ্বারা গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' (১৮৯০) নাটকটিও প্রভাবিত। এই নাটকের ৩/৫ গর্ভাঙ্কে মাতালগণ কর্তৃক মোহিনীর লাঞ্ছনার দৃশ্যে নীলমাধবের অতর্কিতে আবির্ভাব ও মাতালগণের ভয়ে ভীতা হেমাঙ্গিনীকে উদ্দেশ্য করে নীলমাধবের উক্তি—"হেমাঙ্গিনী ! ভয় নেই, ওঠ, ওঠ।"—নবীনমাধবের কথা আমাদের সহজেই মনে করিয়ে দেয়।

'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (১৮৭৫) নাটকের সঙ্গে 'নীলদর্পণে'র আদর্শগত আপাত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁর নাটকের নায়ক চরিত্রের আদর্শ পেয়েছেন নবীনমাধবের মধ্যে। 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' মূলতঃ দেশাত্মবোধক নাটক। ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর (যার প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেল) লাম্পট্য ও দুর্নীতির প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করা হয়েছে এই নাটকে। 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র সমস্যা 'নীলদর্পণে'র মত কোন জাতীয় সমস্যা নয়। নীলকরদের বিরুদ্ধে দীনবন্ধুর জুগুপ্সা ইংরেজ বিদ্বেষের নামান্তর নয়, বরং খাঁটি ইংরেজের চরিত্র মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। 'নীলদর্পণে'র ৩/৩ গর্ভাঙ্কে রোগের উদ্দেশ্যে নবীনমাধবের উক্তিতে এবং ১/৪ গর্ভাঙ্কে রেবতীর কাছে সাবিত্রীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য প্রকাশে ইংরেজ জাতির প্রতি নাট্যকারের মনোভাবটি সংগুপ্ত থাকেনি। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের নাটকে এমন মনোভাবের পরিচয় নেই। এখানে ইংরেজ বিদ্বেষই আসল কথা। উডের ব্যবসায়িক মনোভাব এবং রোগের লাম্পট্য ও অত্যাচার সমকালীন বাংলাদেশে দুর্লভ ছিল না। বরং ক্ষেত্রমণির উপর রোগের লাঞ্ছনা দৃশ্যটির বাস্তবভিত্তি সম্পর্কে অনেকেই একমত। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে লম্পট ম্যাজিষ্ট্রেটের কোন নজীর আমাদের জানা নেই।

মিথ্যাচুরির অভিযোগে ধৃত এবং একটি পরিত্যক্ত ভগ্ন গৃহে আবদ্ধ সুরেন্দ্রের ভগ্নী বিরাজমোহিনীর উপর সুরেন্দ্রের কাছে আকণ্ঠ ঋণগ্রস্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেলের নির্মম অত্যাচার ও তার শ্লীলতা হানির চেষ্টা 'নীলদর্পণে'র ৩/৩ গর্ভাঙ্কের বর্ণনার আদর্শে পরিকল্পিত। এই দৃশ্যে আকস্মিকভাবে নবীনমাধবের মত হরিপ্রিয়ের আবির্ভাব ঘটে এবং স্বীয় বুদ্ধি ও বীরত্বের বলে লম্পট ম্যাজিষ্ট্রেটের কবল থেকে বিরাজমোহিনীকে উদ্ধার করে তার নারীধর্মকে রক্ষা করে।

'নীলদর্পণ' নাটকের অনুসরণে উপেন্দ্রনাথ নায়ক সুরেন্দ্রনাথের উপর ম্যাক্রেণ্ডেলের বিদ্বেষ ও গুলি করে তার প্রাণহানির চেষ্টা এবং সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক পাল্টা আক্রমণ ও সাহেবকে পদাঘাত করে প্রতিশোধ গ্রহণ করার চেষ্টা প্রভৃতি যে সকল দৃশ্যের অবতারণা করেছেন তা 'নীলদর্পণে'র ঘটনাসমূহের মত যথেষ্ট কার্যকারণ সূত্রে অন্বিত নয়। তোরাপ কর্তৃক সাহেবের নাসিকাচ্ছেদন এবং অপমানিত নবীনমাধব কর্তৃক সাহেবকে পদাঘাতের পেছনে যে ঘটনাগত প্ররোচনা (Provocation) বর্তমান, সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক ম্যাক্রেণ্ডেলকে পদাঘাতে এবং এরপর নানা সুযোগে তাকে শারীরিক আঘাত দানের মধ্যে কোন নাটকীয়তা নেই। তাছাড়া, সুরেন্দ্রনাথের নায়কোচিত মহিমাও তাতে বৃদ্ধি পায়নি।

এই নাটকে কারাগারে আবদ্ধ বন্দীদের প্রসঙ্গে 'নীলদর্পণ' নাটকের বেগুনবেড়ের কুঠির গুদামঘরে আবদ্ধ রাইয়তদের কথা মনে করিয়ে দিলেও বন্দীদের বিদ্রোহের প্রসঙ্গ 'নীলদর্পণে'র চাইতে বরং বিগত শতাব্দীর সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষীণ স্মৃতিই অপেক্ষাকৃত কার্যকর হয়েছিল বলে মনে হয়।

'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের দুটি মুখ্য নারী চরিত্র—বিনোদিনী এবং বিরাজ মোহিনীর সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের দুটি নায়িকা চরিত্রের সাদৃশ্য কোন কোন সমালোচক লক্ষ্য করেছেন। বাংলা নাটকে রোমান্টিক নায়িকা চরিত্রের স্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্র। 'নবীন তপস্বিনী'র কামিনী এবং 'লীলাবতী'র লীলাবতী একজাতীয় চরিত্র। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের এই দুই নারী চরিত্র সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> "সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকের বিনোদিনী এবং বিরাজমোহিনী উভয়েই দীনবন্ধুর·····আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহারা প্রেম-পুত্তলিকা মাত্র, প্রেমিকা নারীর জীবন্তরূপ তাহাদের মধ্যে অনুভব করা যায় না।"[১]

মনোমোহন গোস্বামী বিরচিত 'সংসার' (১৩১০) নাটকের ৪/৩ দৃশ্যটি 'নীলদর্পণে'র ৩/৩ গর্ভাঙ্কের আদর্শে পরিকল্পিত। চা-কর বুলসাহেব কর্তৃক সরযুর শ্লীলতা হানির

চেষ্টা ও চরম মুহূর্তে হারাধনের প্রবেশ ও সরযূকে উদ্ধার করবার ঘটনায় রোগ, ক্ষেত্রমণি ও নবীনমাধবের ছায়াপাত সুস্পষ্ট। 'সংসার' নাটকের ৪/৩ দৃশ্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলেই এই সাদৃশ্যটি স্পষ্ট বুঝা যাবে।

সরযূ। সাহেব! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও। আমি ভদ্র লোকের মেয়ে, আমার সর্বনাশ করো না।

বুল। I **know you are a lady.** কুলি Girl আর হামার বাল লাগে না। **Come on darling don't be silly.**

(পুনরায় হস্তধারণ)

সরযূ। ও সাহেব! আমি তোমার মেয়ে,—আমি তোমার মা, আমাকে ছেড়ে দাও।

বুল। টুমি হামার শ্বশুরের মেয়ে, হামার ছেলিয়ার মা হবি?

সরযূ। ওগো! কে কোথায় আছ, আমায় রক্ষা কর!

(সবেগে হারাধনের প্রবেশ)

হারু। পাজী বেটা! হাত ছাড় বলছি, নইলে আজ তোকে খুন করবো। আমি বেঁচে থাকতে তুই কখনই এই ভদ্রলোকের মেয়ের ধর্ম্মনষ্ট করতে পারবি নি।

বুল। **Off you rascal or by Hell you die.**

হারু। আরে রেখে দে তোর 'ডাই'। না হয় প্রাণ যাবে; তবু যে তুই চোখের উপর এই সরলা বালার সর্ব্বনাশ করবি, তা দেখতে পারবো না।"

দৃশ্যটি অভিনয়ের গুণে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসাফল্য লাভ করেছিল।[২] তবু একথা অনস্বীকার্য যে, 'নীলদর্পণে'র সঙ্গে তুলনায় 'সংসার' নাটকের এই দৃশ্যটি ভাবের গভীরতা ও নাটকীয়তার বিচারে অপেক্ষাকৃত নিরুত্তাপ।

'নীলদর্পণে'র ৩/৩ গর্ভাঙ্কটি সমকালীন ছোট বড় অনেক নাট্যকারকেই অনুরূপ দৃশ্য রচনায় অনুপ্রাণীত করেছিল। কিন্তু প্রতিভার তারতম্য বশতঃই হোক বা অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির সাযুজ্যের অভাবেই হোক, অনুরূপ দৃশ্য রচনায় দীনবন্ধুর সাফল্য কেউই অর্জন করতে পারেননি। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'চা-কর দর্পণ বা **The Mirror of a Tea Pianter**' (১২৮১) নাটকে এমনি একটি দৃশ্যের আভাস পাই। নাটকটির বিষয়—আসামের চা-বাগানে কুলি-শ্রমিক নিয়োগ এবং চা-বাগানে শ্রমিকদের উপর নির্যাতন। চা-করের দেওয়ান ('নীলদর্পণে'র আমিনের

মত) নিধুরাম বরদার স্ত্রী সরমাকে বকশিসের লোভ দেখিয়ে চা-কর ম্যাকলিন সাহেবের কাছে নিয়ে যায়। ম্যাকলিন তার সতীত্ব হরণ করবার চেষ্টা করলে সরমা পালিয়ে আসে। কিন্তু নিদারুণ ঘৃণা ও পাপবোধের আতিশয্যে সেখানেই সরমার মৃত্যু হয়। সরমার প্রতি ম্যাকলিনের দুর্ব্যবহার নেপথ্যে সংঘটিত। শুধু সরমার একটি আর্ত চিৎকার ধ্বনিই এই দুষ্কর্মের ইঙ্গিত বহন করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নাট্যকার গ্রন্থের ভূমিকার বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় একটি চিত্র সন্নিবিষ্ট করেছেন যাতে স্খলিত-বসনা এক নারীর উপর এক সাহেব বলাৎকারে উদ্যত। চিত্রের অনুরূপ কোন প্রত্যক্ষ দৃশ্য এই নাটকে নেই। ম্যাকলিন সাহেবের একটি উক্তি প্রণিধান-যোগ্য। সে নিধুকে শাসিয়ে বলেছে, "নীলকর সাহেবদের শামচাঁদ আছে, মোর চাবুক আছে, সেই চাবুক তোমাকে না দিলে, তুমি সিধা হবে না।" শেষ দৃশ্যে সারদার স্ত্রী নৃত্যকালীর আত্মহত্যা অতিনাটকীয়। নাটকের এই উভয় মৃত্যু আকস্মিক। ফলে নাটকের ঈপ্সিত করুণরস জমে ওঠেনি।

মীর মোসারফ হোসেন প্রণীত 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) তিন অঙ্ক ও সর্বমোট ন'টি দৃশ্যে বিভক্ত নাটক। 'নীলদর্পণে'র মতই একটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্যই নাট্যকার নাটকখানি প্রণয়ন করেন। জমিদারদের অত্যাচারের স্বরূপ উদ্ঘাটনই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। নাট্যকার নিজেও জমীদারবংশোদ্ভূত। "পাঠকগণ সমীপে নিবেদনে" নাটক রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাট্যকার বলেছেন,

> "নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালমন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখ তত ভাল হয় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় 'জমীদার দর্পণ' সম্মুখে ধারণ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া ভালমন্দ বিচার করিবেন।"

জমীদার হায়ওয়ান আলীর রিরংসাবৃত্তি ও স্বার্থপরতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এই নাটকে। প্রজা আবুমোল্লার সুন্দরী স্ত্রী নুরুন্নেহাকে আরদালীর সাহায্যে অপহরণ করে নিয়ে এসে তার রিরংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে। গর্ভবতী নুরুন্নেহা এই পাশবিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করে। আবুমোল্লা আদালতে সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়। হায়ওয়ান কৃষ্ণমণি নাম্নী এক বৈষ্ণবীকে কুট্টনী করে নুরুন্নেহার কাছে পাঠিয়ে প্রলোভন প্রদর্শন করে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিল কিন্তু নুরুন্নেহা অত্যন্ত ঘৃণাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

সঙ্গত কারণেই এই নাটকের সঙ্গে 'নীলদর্পণে'র সাদৃশ্য মনে উদয় হয়। শুধু নাম সাদৃশ্যই নয়, নাটকের উদ্দেশ্য ও ঘটনা পরিকল্পনার সঙ্গে, উভয় নাটকের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু নাট্যকারদ্বয়ের ক্ষমতার তারতম্য উভয় নাটকের বৈসাদৃশ্যকে সুস্পষ্ট করেছে। মানবিক রসে সমৃদ্ধ 'নীলদর্পণ' উদ্দেশ্যমূলক রচনা হয়েও শাশ্বত সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে 'জমীদার দর্পণে' এই মানবিকতার অভাব প্রকট। মীর সাহেব তাঁর নাটকের আদর্শ 'নীলদর্পণ' থেকেই পেয়েছিলেন, একথা মনে করা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু বাহ্যিক ঘটনা বিন্যাস ছাড়া আভ্যন্তরীণ শিল্পরহস্য তাঁর কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

হায়ওয়ান আলী অবিমিশ্র লম্পট। রোগ সাহেবের সঙ্গে তার আপাত সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও কম নয়। নিষ্ঠুরতার অন্ধকূপে নিমজ্জিত হয়েও রোগ সাহেবের আত্মসমীক্ষা আমাদের চমকিত করে। আবার রোগ সাহেবের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সন্তান সম্ভাবিতা ক্ষেত্রমণির ব্যাকুলতা ও আপ্রাণ চেষ্টা এবং তজ্জনিত ক্ষিপ্ততার মর্মস্পর্শী দৃশ্য মীর সাহেব অঙ্কন করতে পারেননি। ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ সাহেবের কামুকতার মধ্যে রোমান্সের ঈষৎ স্পর্শ অনুভব করা যায়। কিন্তু নুরুন্নেহার প্রতি হায়ওয়ানের উৎকট কামুকতা দৃশ্যটিকে কলুষিত করেছে। ২/৩ গর্ভাঙ্কের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হবে।

কোশলপুর, হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা।

(মোসাহেবগণ, সর্দারগণ এবং হাওয়ান আলী নুরুন্নেহার হাত ধরিয়া দণ্ডায়মান। নুরুন্নেহা হেঁট বদনে কম্পিতা।)

হায়। কেমন? এখন তো হাতে প'ড়েছ। এখন আর কে রক্ষা কর্ব্বে? বাড়ীতে ব'সে ব'সে যে বলেছিলে ওঁর উপরে কি হাকিম নেই? কই কাকেও যে দেখতে পাইনে? তোমার সে বাবারা কোথায়? এখন দেখে না! এসে রক্ষা করে না! সতী-সতী ক'রে বড় ঢুলে প'ড়তে! এখন সতীত্ব কোথায় থাকবে? আমার হাতে তো পড়তেই হলো, তবে আর এত ভিরকুটী ক'ল্লে কেন? আমার ক্ষমতা আছে কিনা তাও তো দেখলে? আরো এখনি দেখতে পাবে জান্! এতদিন আমার জান্‌কে যে এত হয়রান করেছ জান্! এস তার প্রতিফল দিই!

নুর। (সকরুণে) আপনি সব কর্ত্তে পারেন! আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! জাত্, মান রক্ষা কর্ত্তেও আপনি

প্রাণ রক্ষা কর্ত্তেও আপনি। আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! (রোদন) আপনিই আমার জাত্‌কুল রক্ষা কর্ব্বেন!

হায়। এই যে তাই কচ্ছি! (নুরুন্নেহাকে টানিয়া লইতে উদ্যত)।

নুর। (মাটীতে গড়াইয়া সরোদনে) আমায় ছেড়ে দিন! গলায় কাপড় দে বলছি—আমায় ছেড়ে দিন। আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ। আমার কাপড় অসামাল হলো, কাপড় পড়ি, ছেড়ে দিন!

হায়। (রুমাল দ্বারা মুখ বন্ধন করিতে করিতে) কাপড় নেওয়াচ্ছি।

নুর। (গোঙ্গাইতে গোঙ্গাইতে) পায়ে ধ-র'-আমা—

হায়। (মোসাহেবগণ প্রতি) আপনারা দুইজন হারামজাদীর পা ধরুন, আমি হাত ধ'রে টেনে নিচ্ছি।

(তৃ, এবং চ, বেগে পদ ধারণ এবং খাঁ সাহেব কর্ত্তৃক লম্বমানা নুরুন্নেহাকে আকর্ষণ ও প্রস্থান)

এরপর অন্তরালে হায়ওয়ান নুরুন্নেহার যৌবনের জলে তার কামনার আগুন নিভিয়েছে। শুধু নিজেই নয়, মোসাহেবগণকেও এই আনন্দযজ্ঞে আহ্বান জানিয়েছে,—

হায়। ওহে তোমরা এখানে কি কচ্ছো? তোমরা বুঝি ভাগ চাও না? যাও না—এমন দিন আর কবে পাবে!

নরখাদক জাতির নরহত্যার যে পৈশাচিক উল্লাসের কথা আমরা শুনতে পাই, এ দৃশ্য সেই পৈশাচিকতারই নামান্তর। দৃশ্যটি আমাদের অন্তরে ক্রোধ নয়, জুগুপ্সাই জাগিয়ে তোলে। ক্ষেত্রমণির আত্মরক্ষার ব্যাকুলতা, সন্তান সম্ভাবিতা মাতার সন্তানের অমঙ্গলের দুর্ভাবনা, আপন সতীত্ব সম্পর্কে অতি সচেতনতা পরিশেষে পরিত্রাণের জন্য তার ক্ষিপ্ততার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করি বক্ষ্যমাণ দৃশ্যে তা নেই। ক্ষেত্রমণি নিজেকে 'পোয়াতি' বলে জানিয়েছে, কিন্তু নুরুন্নেহাকে তেমন কোন কথা বলতে দেখলাম না বরং অন্য চরিত্রের মুখে তা প্রকাশিত। আত্মরক্ষার জন্য নুরুন্নেহাকে শুধু ক্রন্দন করতেই দেখি। পরিশেষে তার মৃত্যুও যেমন আকস্মিক ও মৃত্যুকালীন বক্তৃতাও স্বাভাবিকতার বিরোধী।

আবুমোল্লাকেও নবীনমাধবের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। নবীনমাধবের মধ্যে যে প্রতিরোধ প্রবণতা দেখি, আবুমোল্লার মধ্যে তা একেবারেই অনুপস্থিত। আবুমোল্লা স্ত্রীর মৃত্যুর পর আদালতে হায়ওয়ানের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। নাটকের শেষ দৃশ্যে ৩/৩ গর্ভাঙ্কে বিলাসপুর জিলার সেসন আদালতের দৃশ্য 'নীলদর্পণে'র

অনুকরণে রচিত। আগেই বলেছি, বাংলা নাটকে বিচার দৃশ্য 'নীলদর্পণে'ই সর্বপ্রথম রচিত হয়। 'নীলদর্পণে'র মত এখানেও অনুরূপ বিচার প্রহসন চিত্রিত হয়েছে। তবু পার্থক্য আছে। 'নীলদর্পণে'র বিচারক উড সাহেবের বন্ধু ও মিসেস উডের অনুগৃহীত কিন্তু 'জমীদার দর্পণে'র জজ ডাক্তার কানিংহামের বন্ধু। তবু তার রায় যে কেন হায়ওয়ানের পক্ষে গেল তা বুঝে ওঠা দুষ্কর। আর ডাক্তারই বা কেন অমন ভুল ও মিথ্যা পোস্টমর্টেম মেডিক্যাল রিপোর্ট দিল তারও কোন কারণ জানানো হয়নি। পদীময়রাণীর সঙ্গে কৃষ্ণমণির আপাত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু পদী রোগের উপপত্নী পক্ষান্তরে কৃষ্ণমণির বোষ্টম আছে, সে হরিদাস। এরা বোষ্টম বোষ্টমী হয়েও অর্থের লোভে অপরের সর্বনাশ করে বেড়ায়। পদীময়রাণীর মধ্যে যে মনুষ্যত্বের চকিত স্ফুরণ লক্ষ্য করি, কৃষ্ণমণির মধ্যে তার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নি। কৃষ্ণমণির নিষ্ঠুরতা ও অমানুষিকতার সঙ্গে বরং 'প্রফুল্ল' নাটকের জগমণির কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

'নীলদর্পণ' নাটকে দীনবন্ধু পরপর কয়েকটি মৃত্যু ঘটিয়ে দর্শকচিত্তে নীলকরের অত্যাচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই মৃত্যুগুলির মধ্যে সাবিত্রী কর্তৃক সরলতার গলায় পা দিয়ে হত্যার ঘটনা আকস্মিক ও ও অস্বাভাবিক বলে মনে করা যেতে পারে কিন্তু অন্যান্য মৃত্যুগুলিকে একেবারে অযৌক্তিক বলা যায় না। মৃত্যুর আতিশয্যে Tragic মহিমা কিছু ক্ষুণ্ণ হলেও নাট্যকারের উদ্দেশ্য অসফল হয়নি। ত্রুটিহীন না হলেও 'নীলদর্পণে'র বিষাদান্তক পরিণতিই পরবর্তী কালে অধিকাংশ বাংলা নাটকের বিষাদান্তক পরিণতির আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। রামনারায়ণ, গিরিশচন্দ্র ছাড়াও অপেক্ষাকৃত কম শক্তি সম্পন্ন একাধিক নাট্যকার এই পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছিলেন।

রামনারায়ণের 'নবনাটকে'র (১৮৬৬) পরিণতি 'নীলদর্পণে'র অনুরূপ। নাটকের শেষ অংকে (ষষ্ঠাংক) সাবিত্রীর উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার কথা শুনে সুবোধের ঘন ঘন মূর্ছা ও অবশেষে মৃত্যু নাটকটির পরিণতিকে করুণরসাত্মক করেছে। কিন্তু এতটি মৃত্যুর আকস্মিকতা ও অযৌক্তিকতা পাঠকচিত্তে ঈপ্সিত করুণরস জাগাতে সহায়তা করে না। সুবোধের মৃত্যুর মাধ্যমে নাট্যকার যে কারুণ্যকে ঘনীভূত করতে চেয়েছেন, তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হলেও ভাবগভীরতায় তা 'নীলদর্পণে'র অনুরূপ হয়ে উঠতে পারেনি।

পাটনা কলেজের পণ্ডিত নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বারুণী বিলাস' (১২৭৪) নাটকের শেষাংশেও মৃত্যুর আধিক্য লক্ষ্য করি। কিন্তু এই মৃত্যুগুলি যেন সহজেই

পূর্বপরিকল্পিত বলে অনুমান করা যায়, ফলে এই মৃত্যুগুলিতে নাটকীয়তার অভাব ঈপ্সিত রসপরিণতিতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। নাট্যকার সুরাপানের অব্যবহিত ও অনিবার্য পরিণতি যে মৃত্যু সেকথা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন নটীর সংগীতে—

"সুরায় ডুবিল ভুবন।
ইহার প্রবাহ রোধে করগো যতন।
এ জল বিষের প্রায়, জর জর করে কায়, উর্বর উষর হলো
কত উপবন,
করে সুরা রোগ তাপ, করায়িছে কত পাপ, আনিছে বহিয়ে
দেখ অকাল মরণ।"

'চা-কর দর্পণ' প্রণেতা দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'জেলদর্পণ' (১২৮২) নাটকের শেষেও পরপর তিনটি মৃত্যু ঘটনার দ্বারা করুণরস সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণাচরণ 'চা-কর দর্পণে'-র মতই 'জেলদর্পণে'ও আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়ে **Tragedy**-র আদর্শ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

দীনবন্ধুর উত্তরসূরিগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের স্থান সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর 'প্রফুল্ল,' 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের পরিণতি পরিকল্পনা 'নীলদর্পণে'র অনুসারী। 'প্রফুল্ল' নাটকের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'র মত গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' (১৩১২) উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি। বিবাহে পণপ্রথার বিষময় ফল দেখিয়ে নাটক রচনা করবার জন্য সারদাচরণ মিত্র তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। নাটকটি অনুরোধকর্তা সারদাচরণ মিত্রকেই উৎসর্গীকৃত। উদ্দেশ্যমূলকতা শুধু সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রেই নয়, "তাঁর পৌরাণিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক সব পর্যায়ের নাটক সম্পর্কে একথা সত্য—উদ্দেশ্যহীন শিল্পসৃষ্টি তাঁর স্বধর্ম-বিরোধী সেজন্য নাটকে তিনি 'Truth' কে বড়ো করে দেখতেন, 'Art'-কে নয়।"[৩] উদ্দেশ্যের চরিতার্থতার জন্য নাটকখানিকে তিনি নানাবিধ চমকপ্রদ ঘটনার দ্বারা জনপ্রিয় করতে চেয়েছেন, সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। কিন্তু "দীনবন্ধু আন্তরিকতার গুণে উদ্দেশ্যমূলক নাটকের মধ্যেও বাস্তব মানব-চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রতি সুগভীর আন্তরিকতা না থাকার জন্যই গিরিশচন্দ্র অন্যের অনুরোধে লিখিত তাঁহার 'বলিদান' নাটকে তাহা সম্ভব করিয়া তুলিতে পারেন নাই।"[৪]

'প্রফুল্ল'র মতই এই নাটকেও কতকগুলি মৃত্যু ঘটনার দ্বারা নাটকের পরিণতিকে বিষাদান্তক করবার চেষ্টা আছে। হিরণ্ময়ীর জলমগ্ন হয়ে আত্মহত্যা, করুণাময়ের

উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা, সরস্বতীর হার্টফেল নাটকের পরিণতিকে মেলোড্রামাটিক করে তুলেছে। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে হত্যা ও মৃত্যুর ভূমিকা দুর্লক্ষ্য নয়।[৫] কিন্তু একথা ঠিক যে, ট্র্যাজিকরস হত্যা ও মৃত্যুর মধ্যেই একান্ত সীমাবদ্ধ নয়। কার্য-কারণের অনিবার্য যোগাযোগ না থাকলে অযথা হত্যা বা মৃত্যু নাটক বিশেষকে মেলোড্রামার স্তরে নামিয়ে আনতে পারে। 'বলিদানে'র প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সরলতার মৃত্যু নিয়ে জোর তর্ক চললেও 'নীলদর্পণে' গোলোক বসু, নবীনমাধব এবং ক্ষেত্রমণি এমন কি সাবিত্রীর মৃত্যুও অস্বাভাবিক নয় কিন্তু 'বলিদানে' একমাত্র হিরণ্ময়ীর মৃত্যু ছাড়া করুণাময় এবং সরস্বতীর মৃত্যু খুব সহজ বলে মনে হবে না। অবশ্য চমকপ্রদ ঘটনার আতিশয্য ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর পৌনঃপুনিকতা সত্ত্বেও এ নাটক জনপ্রিয় হয়েছিল।

'নীলদর্পণে'র সাবিত্রীর উন্মত্ততা এবং পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ এবং মৃত্যুর সঙ্গে 'শাস্তি কি শান্তি' (১৩১৫) নাটকের ৫/২ গর্ভাঙ্কের পার্বতীর মৃত্যুর গভীর সাদৃশ্য আছে। পার্বতী শাস্ত্র ও সংস্কারের বশবর্তী হয়ে আপন কন্যা প্রমদাকে গ্রহণ করতে পারলেন না। প্রমদা গৃহত্যাগ করল এবং ঘটনাক্রমে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হল। এই সংবাদ শুনে নিজের নিষ্ঠুরতার জন্য পার্বতীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল। কিন্তু পরে যখন প্রমদা ফিরে এল তখন পার্বতী তাকে চিনতে পারলেন না। বরং পেত্নী বলে তাকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেন। এই উন্মত্ততা পার্বতীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করল। অবশেষে তিনি যখন প্রকৃতিস্থ হলেন তখন তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ হল। তিনি প্রমদা ও ভুবনমোহিনীকে ক্ষমা করলেন কিন্তু কিছু পরেই দেহত্যাগ করলেন। সাবিত্রীর উন্মত্ততা ও সরলতাকে হত্যার মধ্যে ঘটনাগত যে অস্বাভাবিকতা ছিল গিরিশচন্দ্র পার্বতীর চরিত্রে তাকে স্বাভাবিকতা দিতে চেয়েছেন কিন্তু গলায় পা দিয়ে সাবিত্রীর সরলতা হত্যার ঘটনাটিকে গিরিশচন্দ্র এড়িয়ে যেতে পারেননি। প্রসন্নকুমার উন্মত্ত হয়ে ৫/৬ গর্ভাঙ্কে ভুবনমোহিনীকে পুনঃ পুনঃ ছুরিকা-ঘাতে হত্যা করে নিজেও মারা গেলেন। নাটকটির শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর ছড়া-ছড়ি। একই দৃশ্যে নিহত ভুবনমোহিনী, আত্মঘাতী প্রসন্নকুমার ও প্রকাশ উপর্যুপরি এই মৃত্যুর ঘটনা নাটকের পরিণতিকে ভয়ানক করে তুলেছে। 'শাস্তি কি শান্তি'র পরিণতিতে 'নীলদর্পণে'র Tragic impression সৃষ্টি হয়নি বরং নাটকটি প্রকারান্তরে Horror tragedy-তে পর্যবসিত হয়েছে। এই নাটকের কয়েকটি সংলাপাংশেও 'নীলদর্পণে'র ছায়াপাত লক্ষ্য করি। ৪/৪ গর্ভাঙ্কে মিঃ বসুর প্রতি

শ্যামাদের উপদেশ 'নীলদর্পণ' নাটকের ৩/৩ গর্ভাঙ্কের রোগ সাহেবের প্রতি নবীনমাধবের উক্তির সাদৃশ্য আছে।

'নীলদর্পণ' নাটকের শেষ দৃশ্যে সাবিত্রীর উন্মত্ততা এবং সরলতার গলায় পা দিয়ে তাকে হত্যা প্রসঙ্গটি গিরিশচন্দ্রের নাটকের বিভিন্ন স্থানে বহুবার অনুসৃত হয়েছে দেখা যায়। 'শাস্তি কি শাস্তি' নাটকে একাধিকবার গলায় পা দিয়ে হত্যা কথাটি পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়েছে। যেমন,

১/৫ গর্ভাঙ্কের শেষে প্রসন্নকুমারের উক্তির অংশ—"আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো ?—তোমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলি।"

৪/১ গর্ভাঙ্কে চিত্তেশ্বরীর উক্তির অংশ—"ওষুধ না খেতে চায়, গলায় পা দিয়ে খাইও !"

৩/৩ গর্ভাঙ্কে পার্বতীর উক্তির অংশ—"শ্বশুর বাড়ীতে জায়গা পাবে না, স্বামী যন্ত্রণা দেবে—তবে সত্যি সত্যি কি মেয়ের গলায় পা তুলে দেবো ?"

৪/২, গর্ভাঙ্কে পার্বতীর সংলাপের দুটি স্থানে "গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলেছে" কথা আছে।

'প্রফুল্ল' নাটকের ২/৪ গর্ভাঙ্কে যোগেশের সংলাপের অংশ—"যেদোর গলায় পা দাও ; আর বুড়ো মাকে চাল কুমড়ী কর।"

'হারানিধি' নাটকে 'গলায় পা দেওয়া' প্রসঙ্গটি একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে।

৩/৫ গর্ভাঙ্কে কাদম্বিনীর উক্তিতে—"কাঙ্গাল মানুষের গলায় পা দিও না।"

৪/৩ গর্ভাঙ্কের দৃশ্যান্তরে হেমাঙ্গিনীর উক্তি—"পেত্নী মাগী বল্‌ছিল……মর, মর ! গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলবো !"

নাট্যাদর্শ, আঙ্গিক বা বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও দৃশ্য ছাড়া 'নীলদর্পণে'র কোন কোন চরিত্রের দ্বারাও পরবর্তী বাংলা নাটকের কোন কোন চরিত্র বিশেষভাবে প্রভাবিত। এপ্রসঙ্গে প্রথমেই সাবিত্রী চরিত্রের উল্লেখ করতে হয়। সাবিত্রীর উন্মত্ততায় যে কিছুটা নাটকীয়তা আছে তা অনস্বীকার্য। 'প্রফুল্ল' নাটকের উমাসুন্দরী চরিত্রে সাবিত্রীর উন্মত্ততার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। 'নীলদর্পণে' মৃতপ্রায় নবীনমাধবের জন্য সাবিত্রীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। 'প্রফুল্ল' নাটকে সুরেশের কারাবাসের সংবাদ শ্রবণে উমাসুন্দরীরও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু মৃতপ্রায় নবীনমাধবকে দেখে সাবিত্রীর উন্মত্ততায় যে স্বাভাবিকতা ও সম্ভাব্যতা আছে সুরেশের কারাবাসের সংবাদে উমাসুন্দরীর মুহূর্তে উন্মত্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতা ও স্বাভাবিকতার মানদণ্ডে গ্রাহ্য হয় না। কারাগারে অত্যন্ত হীনভাবে স্বামীর আত্মহত্যায় সাবিত্রী প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছেন এবং যখন পরপর পাঁচদিন অনশন করে আছেন এমন সময় প্রিয়মত

পুত্রের মর্মান্তিক অবস্থা সাবিত্রীকে সহজেই অপ্রকৃতিস্থ করে তুলেছে। উমাসুন্দরীর ক্ষেত্রে তেমন কোন কার্য-কারণের যোগসূত্র নাট্যকার রচনা করতে পারেননি। সাবিত্রী ও উমাসুন্দরীর অপ্রকৃতিস্থতার প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্যও কম নয়। উমাসুন্দরী সাবিত্রীর মত কাউকে হত্যাও করেননি বা তাঁর নিজেরও মৃত্যু হয়নি, তবু তাঁর অবস্থা জীবন্মৃতবৎ।

সাবিত্রী অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সরলতাকে 'বিবি' বলে মনে করেছেন, আর উমাসুন্দরী একই অবস্থায় সুরেশকে 'শ্বশুর' বলে সম্বোধন করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজী নাটকের আদর্শে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটকেই প্রথম উন্মাদ চরিত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এরপর দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' এবং পরে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' ও 'জনা' নাটকে এই পুত্রশোকাতুরা জননী চরিত্রের অনুবর্তন লক্ষ্য করি। উমাসুন্দরীর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় আচরণের সঙ্গে **Lady Macbeth**-এর অপ্রকৃতিস্থতার একটা সাদৃশ্য আছে। অবশ্য দীনবন্ধু 'কমলে কামিনী' নাটকের গান্ধারী চরিত্রেও অনুরূপ আচরণ ঘটিয়েছেন। এই সামান্য বৈসাদৃশ্যটুকু ছাড়া উমাসুন্দরীর উপর সাবিত্রীর প্রভাবই বেশী।

রামচন্দ্র দত্ত রচিত 'মাতালের জননী বিলাপ' (১৮৭৪) প্রহসনের হরিশের জননী সাবিত্রীর আক্ষেপে 'নীলদর্পণে'র সাবিত্রীর উক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মদ্যাসক্ত হরিশের অধঃপতনে সাবিত্রী বিলাপ করে বলেন,—

> "মদ কি আমার সর্ব্বনাশ করবার জন্যে ইংরেজরা এনেছিল, ইংরেজেরা না দেশের রাজা!—এ যে রাজার সাক্ষাতে দেশ খেয়ে ফেল্লে, রাজার কি বল নেই, কামানের কি জোর নেই যে দমন কর্ত্তে পারেন—হায় এমন দিন কবে হবে—যেদিন সকলে মদ গরল বলে আর ছোঁবে না।"

'নীলদর্পণে'র আদুরী একটি বিশিষ্ট চরিত্র। ক্ষণিক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে নানা কারণে সে আমাদের মনে একটা স্থায়ী আসন লাভ করেছে। বাংলা নাটকে এই চরিত্রের অনুসরণ খুব বেশী নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক 'রাণা প্রতাপসিংহ' (১৩১২) নাটকে এমনি একটি চরিত্ররূপায়ণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি। মানসিংহের ভগ্নী রেবার বৃদ্ধা পরিচারিকার আচরণে আদুরীর প্রভাব কোন কোন সমালোচক লক্ষ্য করেছেন।[৩] রেবার ধাত্রীর সঙ্গে আদুরীর সাদৃশ্য যেমন আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না।

সরলার প্রশ্নে আদুরী তাঁর বিগত দাম্পত্যজীবনের রোমাণ্টিক দিনগুলির কথা বেদনাতুর কণ্ঠে রোমন্থন করেছে। প্রোষিতভর্তৃকা পতিবিরহাতুরা সরলতা এই

বৃদ্ধা দাসীর দাম্পত্য প্রেমের ইতিহাস শুনে নিজের বিরহতাপকে যেন ক্ষণিকের জন্য ভুলতে চেয়েছিল কিন্তু রেবার বৃদ্ধা পরিচারিকার স্মৃতিমন্থন অহেতুক। রেবা তার জীবনের ইতিহাস শুনতে চায়নি, অথচ রেবার বিবাহের সংবাদ পরিবেশন করতে এসে নিতান্ত উপযাচিকা হয়েই এই পরিচারিকা নিজের দাম্পত্য-প্রেমের ইতিহাস শোনাতে বসেছে। (১/৫)

"...এককালে আমারও যৈবন ছিল, তখন আমার চোখ দুটো ছিল টানা টানা, গাল দুটো ছিল টেবো, টেবো, আর গড়নটাও নেহাইৎ কিছু অমন্দ ছিল না।—মিন্সে তখন আমার কত খোসামোদ কর্ত্ত। একদিন কাছে ডেকে কত আদর করে'—"

তার এই দাম্পত্য-প্রেমচর্চায় রেবা বিরক্ত হয়ে বলেছে,—"কে তোর প্রেমের ইতিহাস শুনতে চাচ্ছে?—যা, বিরক্ত করিসনে বলছি। ভাল হবে না।"

তবুও সে থামেনি, রেবার বিরক্তি বাড়িয়েই চলেছে। রেবা তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে—

রেবা। "জ্বালাতন কর্লে। যা বলছি। যাবিনে?"

পরিচারিকা। ওমা যাবো কি গো? তোমাকে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইতে এলাম; তাকি ছোট নোক বলে এমনি করে মেরে তাড়িয়ে দিতে হয়!"

"দাড়ি প্যাজ না ছাড়লি মুই তো কথনুই যাতি পারবো না, থু, থু, থু,! গোন্দো, প্যাজির গোন্দো!"—

উক্তিতে আদুরী অবদমিত আসঙ্গলিপ্সা উঁকি দিয়েছিল কি? স্বামী সোহাগের উজ্জ্বল স্মৃতি বহন করেও কি পরকীয় রসের লিপ্সা তাঁর মনে সংগুপ্ত ছিল? বিষয়টি সম্ভবতঃ এভাবে না দেখলেও চলে। পলাণ্ডুখাদক সাহেবদের প্রতি ঘৃণার তীব্রতা বুঝাতেই আদুরী এমনভাবে নিজেকে জড়িয়ে কথাটি বলে থাকবে। সরলস্বভাবা আদুরী তার কথার গুরুত্ব পর্যালোচনা করে দেখেনি। রেবার পরিচারিকার উক্তিতেও এমন মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

"তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, আর তোমাকে নিয়ে দরকার কি? তবে কি আমাকে নিয়ে দরকার? ওমা বলে কিগো! আমার বিয়ে যা হবার তা একবার হয়ে গিয়েছে! মেয়ে মানুষের বিয়ে কি আর দুবার করে হয় বাছা! তাহলে কি আর ভাবনা ছিল? আর এই বয়সে আমাকে বিয়ে কর্ব্বেই বা কে?—"

—আদুরীর উক্তির **Humour** এই পরিচারিকার উক্তিতে অনুপস্থিত। আদুরীর স্বভাব ও বচনের ধার দ্বিজেন্দ্রলাল পরিচারিকার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

॥ ৩ ॥

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' (১৮৬৫) প্রহসনটি দীনবন্ধুর 'নবীনতপস্বিনী'র জলধর-মালতী-মল্লিকা ও রতিকান্তের ঘটনারই রকমফের। প্রহসনটিতে দীনবন্ধুর প্রভাব সুস্পষ্ট। সুধীরের প্রবাসকালীন দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে অগ্রজতুল্য ভোলানাথ সুধীরের স্ত্রী সুমতির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভোলানাথ মতের মাকে (দাসী) নানাভাবে প্ররোচিত করতে থাকে। সংকট মুহূর্তে প্রবাস থেকে সুধীর ফিরে এলে সুমতি তাকে সব কথা জানায়। এদিকে 'মুন্সোব' বাবুও সুমতিকে পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল। সুধীরের পরামর্শে সুমতি ভোলানাথ ও মুন্সোবকে শায়েস্তা করতে সম্মত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় ভোলানাথ এবং মুন্সোব দুজনেই পরপর সুমতির বাড়িতে আসে। ভোলানাথ আগেই এসে সুমতির সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করতে থাকে। ইতিমধ্যে মুন্সোবের আগমনে ভীত ভোলানাথকে সুমতি ও মতের মা গদী চাপা দিয়ে রাখে। মুন্সোব এলে তাকে গদীচাপা ভোলানাথের উপরই বসতে দেওয়া হয়। পরিকল্পনামত কিছুক্ষণ পরেই সুধীরের আগমনে ভীত সন্ত্রস্ত মুন্সোবকে বস্তায় পুরে মাছের চুপড়ি মাথায় দিয়ে দেওয়া হলে সুধীর ঘরে ঢোকে। এরপর দুজনকেই চুনকালি মাখিয়ে ভোলানাথকে গাধা বানিয়ে মুন্সোবকে সেই গাধার পিঠে উল্টো করে বসানো হল।

রামনারায়ণের প্রহসনটিতে দীনবন্ধুর অনুসরণ থাকলেও এতে নাটকীয়তা আছে। ঘটনাসন্নিবেশের মধ্যে নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। পাত্র-পাত্রীর মধ্যেও হুবহু সাদৃশ্য নেই। সুধীর রতিকান্তের মত সন্দেহপ্রবণ নয়; মতের মা মল্লিকার মত মুখরা নয় যদিও সে সুমতির শুভানুধ্যায়িনী। সুমতির পরামর্শমত সেও এই লম্পটদ্বয়ের শায়েস্তা করার ষড়যন্ত্রে সানন্দে যোগ দিয়েছে। 'মালতী'র প্রতি জলধরই ছিল আসক্ত কিন্তু এখানে ভোলানাথ ছাড়াও মুন্সোবকে সুমতির প্রতি আসক্ত হতে দেখি। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে ভোলানাথ ও মুন্সোবের হেনস্তার দৃশ্য পরিকল্পনায় রামনারায়ণ দীনবন্ধুর অনুস্থিতি সত্ত্বেও স্বকীয়তার পরিচয় দিতে পেরেছেন।

লম্পটের রিরংসাবৃত্তির যথোপযুক্ত শাস্তিবিধানে রামনারায়ণের মত অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী 'গোলক ধাঁদা' (১৮৮২) প্রহসনে। প্রহসনটিতে প্রধানতঃ নিশ্চিন্তপুরের জমিদার কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর কামুকতা ও তার পরিণাম দেখানো হয়েছে। অবশ্য দেওয়ান, মোসাহেব রামকুমার, হরিহর তাঁতী প্রভৃতি এই বামাচারে জমিদারের সামিল হয়েছে। কৃষ্ণকান্ত চরিত্রটির উপর জলধরের প্রভাব অনুভব করা যায়। নায়িকা বিনোদবালা মালতীর অনুরূপ। বিনোদবালার

দাসী লক্ষ্মী ঝির সঙ্গে মল্লিকা অপেক্ষা রামনারায়ণের মতের মার সাদৃশ্য বেশি। শিবু ওরফে নগেন্দ্রনাথের লোক চিনবার উদ্দেশ্যে পাগল সেজে থাকা যেমনই হোক, স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষার আগ্রহ তাকে রতিকান্তর সন্দেহপ্রবণতার অংশভাগী করেছে। পাগল শিবুর ছদ্মবেশী নগেন্দ্রনাথের পরামর্শে এবং লক্ষ্মী ঝির সহায়তায় বিনোদবালা একের পর এক যেভাবে হরিহর, সাহেব রামকুমার, দেওয়ান ও জমিদারকে অপদস্থ করেছে তার অভিনবত্ব সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লক্ষ্মী ঝি কর্তৃক দেওয়ানকে ভেড়া বানানোর পরিকল্পনা হ'দোল কুৎ কুৎ বানানোর পরিকল্পনার অনুরূপ। দরোজায় জমিদারের করাঘাতের শব্দে ভীত দেওয়ানকে লক্ষ্মী ঝি প্রথমতঃ গুড়ের গামলায় অভিষিক্ত করে পরে তুলোর মধ্যে বসিয়ে ভেড়া তৈরী করে। সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে গলায় দড়ি বেঁধে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখে যাতে জমিদার কৃষ্ণকান্ত তাকে ভেড়া বলে ভুল করেন।

অত্যন্ত কৃপণ এবং সেই সঙ্গে কামার্ত এক চরিত্র এঁকেছেন অমৃতলাল বসু তাঁর "কৃপণের ধন' (১৯০০) নামক প্রমোদ প্রহসনে। এতে 'নবীন-তপস্বিনী'র জলধর চরিত্রের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। হলধর এই নাম এবং তার কামুকতার হাস্যকর পরিণতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হলধর—স্ত্রী দয়াময়ীর অলক্ষ্যে এক বিধবাকে তার কামনার ইন্ধনরূপে পেতে চেয়েছিল যাদের সহায়তায়, তারাই অবশেষে চিত্র-বিচিত্র বদন ও গলরজ্জুবদ্ধ হলধরকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এল দয়াময়ীর কাছে। মধুখুড়ো ঘটনার বর্ণনা করে বলেছে—

> "মাসী, ব্রজদাসের বিধবার টোনী হতে ইচ্ছে হয়েছিল, এক ব্যাটা নাপ্‌তেকে ঘটক করেছিলেন, সে সতী লক্ষ্মী —তাকে পাবে কেন? নাপতে বেটা একটা বাজারের মেয়ে মানুষ নিয়ে গিয়ে মদ খাইয়ে এই চিত্তির বিচিত্তির ক'রে গলায় দড়ি লাগিয়ে বেঁধে ফেলে গেছলো, আমি হঠাৎ সেখানে গিয়ে এই মূর্তি দেখতে পাই, তাই গাড়ী করে আনলুম।"

অম্বিকাচরণ গুপ্ত লিখিত 'কলির মেয়ে ছোট বৌ ওরফে ঘোর মূর্খ' (১৮৮১) প্রহসনটি স্বামীর মূর্খতায় স্ত্রীর ব্যভিচার-প্রবণতার সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে রচিত। নির্বোধ শ্যাম ভট্টাচার্যের স্ত্রী চতুরা সারদা স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত। বাড়ির চাকর পরাণের সঙ্গেও তার অবৈধ মিলন ঘটে। এহেন স্বৈরিণী কর্তৃক কামাসক্ত অবিনাশকে গুড় মাখিয়ে পাট দিয়ে মুড়িয়ে গরু বানানো এবং গোপালবাবু নামক অপর ব্যক্তিকে বাউলের জামা পরিয়ে হাতে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড় করানো এবং প্রিয়বাবু নামক অপর আর এক ব্যক্তিকে ডেকে এনে প্রেমালাপে লিপ্ত

হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন রসাবেদন সৃষ্টি করে। 'নবীনতপস্বিনী'র সঙ্গে পরিকল্পনাগত আপাত সাদৃশ্য থাকলেও এই নাটকের ভাবাদর্শগত বৈপরীত্য এই সাদৃশ্যকে অকিঞ্চিৎকর করে তুলেছে।

মনোমোহন বসুর 'প্রণয় পরীক্ষা' (১৮৬৯) নাটকের শান্তবাবুর চরিত্রে 'নবীনতপস্বিনী'র রাজা রমণীমোহনের আংশিক প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। মহামায়া কর্তৃক নানা ষড়যন্ত্রে শান্তবাবুকে সরলার প্রতি সন্দিগ্ধ করে তোলা এবং গর্ভবতী সরলাকে অসতী প্রমাণ করানোর ঘটনায় 'নবীনতপস্বিনী'র আভাষ ফুটে উঠেছে। কিন্তু পার্থক্য হল, বড়রাণীর গর্ভজাত সন্তান যে নিজেরই সন্তান সেকথা রমণীমোহন জানতেন, পক্ষান্তরে ঔষধের প্রভাবে 'মোহাচ্ছন্ন' শান্তবাবুর তা জানা ছিল না। পরিশেষে মহামায়া শান্তবাবুর এই অবস্থাটিকে কাজে লাগিয়েছিল। রাজা রমণীমোহনের মতই শান্তবাবুরও আত্মগ্লানি দেখা দিয়েছিল।

॥ ৪ ॥

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অনুকরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬)। সত্তর বছরের বুড়ো অতি কৃপণ ভজহরির চতুর্থবার দারপরিগ্রহ করবার বাসনা ও তার পরিণতি প্রদর্শনই প্রহসনটির মুখ্য উদ্দেশ্য। ভজহরির কৃপণতা রাজীবলোচনকেও ছাড়িয়ে গেছে। এঁটো পাতের উচ্ছিষ্ট লবণটুকুর জন্যও তার কার্পণ্য এই ভজহরিকে 'কৃপণতা'র এক মূর্তিমান বিগ্রহে পরিণত করেছে। এ হেন কৃপণের বিবাহ-বাসনার কারণ,—

> ভজ। "(স্বগত) রামবেটা ভারি চোর। এতগুলো পয়সা নিলে, আর দেখো-না ঠোঙা করে কি একরত্তি নিয়ে আসবে এখন। ওর সঙ্গে আর পারা যায় না। আবার বিবাহ না করলে আর চলছে না। ঘরে গিন্নি না থাকলেই যত দুর্দশা। কেই-বা দেখে, কেই-বা শোনে। না, বিয়েটা করতেই হচ্ছে। লোকে একটু হাসবে, এই বই তো নয়, তাতে আর কি—আমার টাকা তো বাঁচবে। আর আমার বয়সও এমনই কি হয়েছে—৭০ বই তো নয়—লোকে যে ৯০ বৎসরেও বিয়ে করে—তা পুরুষ মানুষের এতে লজ্জা কি! রামকে একটি কনের সন্ধান করতে বলতে হচ্ছে।..."

উদ্ধৃত সংলাপের মর্মার্থ, ভজহরির কৃপণতার একজন সহায়িকা প্রয়োজন।

দৌহিত্র কুঞ্জবিহারীর পরিচালনায় থিয়েটারের বন্ধুবান্ধবদের কনে, কনেকর্তা, ঘটক ইত্যাদি সাজিয়ে দাদামশায়ের বিবাহসাধ পূর্ণ করা হল। বাসরঘরে নবীনা-

যুবতী লাভে উল্লসিত ভজহরি কনের সঙ্গে আলাপ শুরু করে। প্রেমালাপের বাজে খরচ বাঁচিয়ে কনে ভজহরির সঙ্গে সাংসারিক কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে ভজহরিকেও চমকে দিয়েছে ছেঁড়া গামছা দিয়ে ধুতি তৈরী করবার নামতা শুনিয়ে—

"গামছাকে গামছা
গামছা দুগুণে কাছা
দুই কাছায় পণে ধুতি
চার কাছায় ধুতি।"

স্ত্রীর বিবেচনাশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে ভজহরি এমন 'স্ত্রীরত্নে'র হাতে বাক্সের চাবি দিয়ে নিদ্রাভিভূত হয়। আর এই ফাঁকে 'নববধূ' বাক্সের সব টাকা নিয়ে কুঞ্জবিহারীদের সঙ্গে মিলিত হয়। দৌহিত্র কুঞ্জবিহারী দাদামশায়ের কৃপণতার উপযুক্ত সাজা দিয়ে প্রাপ্ত টাকায় স্ফূর্তি করতে চলল।

সর্বমোট চারদৃশ্যের ক্ষুদ্রাকার এই প্রহসনটিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিয়ে পাগলা বুড়ো রাজীবলোচনের একটি বিশুদ্ধ ক্যারিকেচার প্রস্তুত করেছেন। অবশ্য রাজীবের বিবাহবাতিকতা কৃপণতার অনুষঙ্গী নয়, অশক্ত বৃদ্ধের আসঙ্গলিপ্সার পটভূমিতেই রাজীব দণ্ডায়মান, পক্ষান্তরে ভজহরির বিবাহসাধ তাঁর প্রচ্ছন্ন আসঙ্গলিপ্সা-প্রণোদিত কিনা নাট্যকার তার ইঙ্গিত দেননি বরং কৃপণতার লীলাসঙ্গিনী লাভের আকাঙ্ক্ষার কথাই এতে ব্যক্ত হয়েছে। এদিক থেকে উভয় প্রহসনের প্রতিপাদ্য বিভিন্ন।

যাইহোক, রাজীবলোচনের বিবাহবাতিকতা, তার বার্ধক্যকে ঢাকবার জন্য হাস্যকর প্রচেষ্টা, বাসরঘরে নারীবেশিদের কানমলা খেয়ে 'দম আটকালো, হাঁপিয়েচি মা, ও রামমণি'—বলে কাতরোক্তি এবং সর্বশেষে প্যাচোর মায়ের 'কনে'রূপে আত্ম-প্রকাশে রাজীবের আশাভঙ্গ—সমগ্র প্রহসনখানিকে যে বিশুদ্ধ হাস্যরসে মণ্ডিত করে রেখেছে তার ছিটে ফোঁটাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনে লভ্য নয়। রাজীবকে জব্দ করবার জন্য রতা প্রভৃতির ষড়যন্ত্রের মধ্যে যে নাটকীয়তা ছিল, দাদামশায় ভজহরির কৃপণতার সাজা দিতে গিয়ে কুঞ্জবিহারীর একই ধরনের ষড়যন্ত্রে তেমন কোন নাটকীয়তা ফুটে ওঠেনি। দীনবন্ধুর প্রহসনে কৌতুকহাস্য বিশুদ্ধ হিউমারে পরিণত হয়। প্রহসনের শ্লেষ-কৌতুকের মধ্যেও উষ্ণ হৃদয়ানুভূতি সঞ্চারের দুর্লভ কৃতিত্ব যা দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনের বিশিষ্টতা তা শুধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথে কেন, অন্যত্রও খুব সুলভ নয়। স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় লেখা নয় বলেই হয়ত প্রহসনটি এমন বৈচিত্র্যহীন শুষ্ক কৌতুক সর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়েছে। চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে তিনি এই প্রহসনটি রচনা

করেছিলেন।৭ সুতরাং নিতান্ত দায়-সারা গোছের এই রচনায় উৎকৃষ্ট শিল্পরসের আশা করা বৃথা।

কৃষ্ণবিহারী রায়ের 'পশ্চিম প্রহসন' (১৮৯২)-এর গবেন্দ্র চরিত্রে রাজীবলোচনের প্রভাব সুস্পষ্ট। ষাট বছরের বুড়ো কুব্জপৃষ্ঠ গবেন্দ্র পুত্র কন্যা, নাতি-নাতনী সব থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহের জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বুড়োর বিবাহবাতিকতায় গ্রামবাসী তাকে নিয়ে ছদ্মবিবাহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ঘটনাবৈচিত্র্যে প্রহসনটি এজাতীয় রচনার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান লাভের অধিকারী নিঃসন্দেহ। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র আদর্শ সম্পর্কে লেখক সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁর প্রহসনটি যে দীনবন্ধুর অনুকরণ নয়, সেকথা তিনি প্রহসনের ভূমিকায় আমাদের পূর্বাহ্ণেই জানিয়ে দিয়েছেন।

> "এ পুস্তকের কেবল দুই এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াই 'এ বিয়ে পাগলা বুড়ো', এ আবার পড়িব কি বলিয়া যদি কেহ তাচ্ছিল্যপূর্ব্বক পুস্তক পাঠ করিতে বিরত হয়েন, তাহা হইলে তিনি প্রতাড়িত হইবেন, কারণ ইতিহাস ও মাতামহীর রূপকথাতে যে প্রভেদ আমার নায়ক ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে সেই প্রভেদ। লোভের সম্পূর্ণ বশীভূত হইলে মানুষ জ্ঞানান্ধ হইয়া অপদার্থ হইয়া যায়, আমাদের নায়ক তাহার জীবন্ত ও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।"

নাট্যকার স্পষ্টতঃই দীনবন্ধুর প্রহসনকে 'মাতামহীর রূপকথা' বলে অভিহিত করেছেন (স্বয়ং বঙ্কিমের অভিমত কিছু ভিন্নরূপ—সেকথা স্মর্তব্য)। তাঁর প্রহসনটি যে সত্যঘটনামূলক, সেকথাও জানিয়ে দিয়েছেন ঐ ভূমিকাতেই—

> "ইহার কোন অংশ কল্পনাপ্রসূত নহে। পশ্চিম দেশীয় বাঙ্গালী সমাজে সময়ে সময়ে নানারূপ বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এই আখ্যায়িকা সেই ঘটনাপুঞ্জের অন্যতম শাখা অবলম্বন করিয়া লিখিত। বলা বাহুল্য যে, কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এ পুস্তক লেখা হয় নাই।"

নাট্যকারের কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও অনুসন্ধিৎসু পাঠক 'পশ্চিম প্রহসনে'র ঘটনা পরিকল্পনায়, গ্রামবাসীগণের ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনায়, কিছু কিছু চরিত্র বিষয়ে দীনবন্ধুর স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করবেন, এ কথা সহজেই বলা যায়।

কৃষ্ণবিহারী রায়ের মতই কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার রাজীবলোচনকে প্রসারিত করেছেন বিয়ে পাগলা রামতারণ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে। তাঁর 'রামের বিয়ে' প্রহসনের (১৮৭৬) কেন্দ্রীয় চরিত্র এই বৃদ্ধের আচরণ রাজীবলোচনেরই মত। তার বিবাহবাতিকতাও আসঙ্গলিপ্সারই প্ররোচনা। গোপাল নামক জনৈক ব্যক্তি যেভাবে রামতারণকে

নাস্তানাবুদ করে, তাতে রতার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। এছাড়া ছদ্মবেশী মামাশ্বশুর ভূপেনের কাছে তার বিদ্যার পরিচয় প্রদান, ঘটকের কাছে রাজীবের পাঠাভ্যাস প্রমাণের অনুরূপ। নবপরিণীতা বধূর প্রতি রামমণির সম্ভাব্য দুর্ব্যবহারের কথা চিন্তা করে রাজীবের পূর্বপরিকল্পনা প্রস্তুতের সঙ্গে রামতারণের কুৎসিতা মাকে স্ত্রীর কাছে 'চাকরাণী'র পরিচয় দেবার মতলব সমধর্মী। তবে বিবাহের ব্যাপারে রামতারণ যে-ভাবে পাড়ার যুবকগণ কর্তৃক প্রতারিত হয়, তা 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' থেকে যেমন আলাদা তেমনি প্রতারণার দায়ে রামতারণকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া এবং সেজন্য তিন মাসের কারাদণ্ড ভোগের ব্যবস্থা অযৌক্তিকই শুধু নয়, প্রহসনটির লঘুমেজাজ তাতে বিনষ্ট হয়েছে। 'লঘুপাপে গুরু দণ্ডে'র মত নাট্যকার তাঁর নায়কের বিবাহবাতিকতার অমানুষিক সাজার ব্যবস্থা করে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছেন।

॥ ৫ ॥

'নীলদর্পণে'র পরে পরবর্তী বাংলা নাটকে 'সধবার একাদশী'র প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মদ্যাসক্তি ও বেশ্যাসক্তির আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে কলকাতার যুবসমাজ রসাতলে নিমজ্জিত হয়েছিল, তারই নাট্যরূপ রচনা করেছিলেন দীনবন্ধু। এই মদ্যাসক্তি ও বেশ্যাসক্তির ফলে যুবসমাজের প্রত্যক্ষ অধঃপতন ছাড়াও এদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে যাদের ভাগ্য, তাদের হাহাকার ও মর্মবেদনার ইঙ্গিতকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন দীনবন্ধু। বাঙালী জীবনের অন্তঃপুরে অনেক রমণীই হয়ত সেদিন কুমুদিনীর মত আক্ষেপ করতেন। নিমচাঁদের মত চরিত্র খুব বেশী না থাকবারই কথা। ভোলাচাঁদ,রামমাণিক্য বা অটল অথবা, স্ত্রীবশ জীবনচন্দ্রের মত চরিত্রের দেখা পাওয়া সেদিনের মত আজও হয়ত দুর্লভ নয়।

মদ্যাসক্তি বা বেশ্যাসক্তির কুফল প্রদর্শন করে দীনবন্ধুর আগেও প্রহসন রচিত হয়েছে যেমন, 'চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা' (১৮৫৮), 'বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক' (১৮৬০), 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি' (১৮৬৩) প্রভৃতি। নির্দিষ্ট কয়েকটি রচনা ছাড়া এ বিষয়ে লেখা নাটক-প্রহসনগুলি দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র পরেই রচিত হয়। তবে এবিষয়ে লেখা সব রচনাই যে দীনবন্ধুর দ্বারা অনুপ্রাণিত এমন কথা ইতিহাস সমর্থিত হবে না। একই বিষয়ে মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা' রচনা করেছিলেন। মধুসূদনের দ্বারা দীনবন্ধুও প্রভাবিত, সেকথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সুতরাং মদ্যাসক্তি ও বেশ্যাসক্তির কুফল প্রদর্শন করে পরবর্তী কালে যেসব নাটক প্রহসন রচিত হয়েছে, সেগুলি—যেমন, 'বারুণী বিলাস' (১৮৬৭), 'চক্ষুদান' (১৮৬৯)

'সুধা না গরল' (১৮৭০), 'একাদশীর পারণ' (১৮৭০), 'উদ্ভট নাটক' (১৮৭০), 'জ্ঞান দায়িনী' (১৮৭১), 'বিধবার দাঁতে মিশি' (১৮৭৪), 'মাতালের জননী বিলাপ' (১৮৭৪), 'আমি তো উন্মাদিনী' (১৮৭৪), 'ইহারই নাম চক্ষুদান' (১৮৭৫), 'যেমন দেবা তেম্নী দেবী' (১৮৭৭), 'দ্বাদশ গোপাল' (১৮৭৮), 'কমলা কাননে কলমের চারার আঁটী' (১৮৮০), 'এই এক প্রহসন' (১৮৮১), 'প্রেমের নক্সা বা রগরের চাঁচি' (১৮৯৯) প্রভৃতি প্রহসনগুলির বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ না করে এই প্রহসনগুলি এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত নাটকসমূহের যে যে ঘটনা ও চরিত্রের উপর 'সধবার একাদশীর' অনুরূপ ঘটনা ও চরিত্রের স্পষ্ট প্রভাব আছে, তাই আলোচনা করব। উল্লিখিত কয়েকটি প্রহসনের নামকরণ যেমন,—'একাদশীর পারণ', 'বিধবার দাঁতে মিশি' প্রভৃতিতে 'সধবার একাদশী' নামের ভাবৈক্য অনুভব করা যায়।

বিপিনবিহারী দে রচিত 'একাদশীর পারণ' (১২৭৭) প্রহসনখানি মূলতঃ সধবার একাদশী'র আদর্শে রচিত। 'সধবার একাদশী'র বিষাদান্তক পরিণতি এখানে সুখান্তক পরিণতি লাভ করেছে। এই নাটকের প্রধান চরিত্রসমূহ যেমন, আশুতোষ (আত্মারাম বাবুর পুত্র), সুধাচাঁদ দত্ত (আশুতোষের জনৈক ইয়ার), হেমাঙ্গিনী (বারবণিতা), প্রেমালিঙ্গিণী (আশুতোষের স্ত্রী) যথাক্রমে 'সধবার একাদশী'র অটল, নিমচাঁদ, কাঞ্চন, কুমুদিনীর আদর্শে রচিত। সাদৃশ্য যেমন আছে *তেমনি কিছু বৈসাদৃশ্যও যে নেই, তা নয়। সুধাচাঁদ স্ত্রী কামিনীর প্রভাবে* মদ ত্যাগ করেছে এবং আশুকেও মদ ছাড়তে অনুরোধ করেছে। নাটকের শেষাংশে দেখি, আশুতোষও মদ ও বারবণিতার সংস্রব ত্যাগ করে প্রেমালিঙ্গিণীর প্রেমপাশে ধরা দিয়েছে। 'সধবার একাদশী'র দ্বারা প্রভাবিত হলেও এখানে নিমচাঁদের অবিস্মরণীয় চরিত্রাদর্শ বা অন্তঃপুরিকাগণের হৃদয়ার্তি পাঠকের চিত্তকে খুববেশী নাড়া দিতে পারে না। বাহ্য সাদৃশ্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে,—

সুধা। ...আশু! এখন আমার কথা শোন্। দিন কতক চেপে যা, আর বাইরে ইয়ারকি টিয়ারকি দিস্নে, হিমির বাড়িতে যাস্নি। আপনার ওয়াইফকে নিয়ে মজা কর।—দিন কতক।

.....

আশু। আমি মাগ চাইনে।

সুধা। মাগ চাও না কেন? বাপকে একটিন্ দিয়ে নিশ্চিন্ত আচ নাকি?" (১ম অংক)

আশু। "(হেমাঙ্গিনীর হস্ত ধরিয়া) জানি! আমি তোমার বিরহে মরে আচি। তুমি কি আমাকে ত্যাগ কল্লে জানি?

হেমা। আমি আর ত্যাগ কল্লুম কেমন করো, তোদের বাড়িতেই ত ত্যাগ করালে। তা বেশ হয়েচে, এখন মাগ্ নিয়ে সুখে থাক্।

সুধা। ওটা অন্তরস্ত, না মুখস্ত?

হেমা। (ক্রোধভরে) তুই আর জ্বালাস্‌নি বাবু, তোর ট্যাপ ট্যাপানি কথা শুনে, আর এখানে আস্‌তে ইচ্ছা করে না।

সুধা। (করযোড়ে) মাসি! আমার সঙ্গে এত ঝকড়া কর কেন; আমাকে কি সতীত ভাব?

আশু। জানি! আমি মাগ চাইনি, তুমি আমার মাগ, তুমি আমার জানি, আমি আর কারেও জানি নি।

.....

হেমা। আশু! এখন ভাই আমি বাড়ী যাই, আজ শীঘ্র শীঘ্র যেতে হবে।

আশু। এত রাত্তিরে কোথা যাবে জানি?

সুধা। মাসি! ঘরে মেসোকে ঘুম্ পাড়িয়ে এসচ নাকি?

.....

হেমা। আমার ঘরে কেউ আসে নাকি?

সুধা। আপ্‌নার ঘরে নয়, গৃহে আসেন, আর গাড়িতে আপনার ডানদিকে বসে আসেন।—সেকি তোমার দাদা হয়।

আশু। (রোদনস্বরে) জানি! সুধাচাঁদ, কি বলে জানি, তুমি আমাকে ত্যাগ কল্লে জানি? আমি এখনি মরব, আমি গলায় ছুরি দেব। (ভূমে শয়ন)"

জানির জন্য জান দিতে উদ্যত আশুতোষ হেমাঙ্গিনী চলে যাওয়ার পরই সুধাচাঁদকে বলেছে—

আশু। "(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সুধো! হিমি চলে গ্যাছে? বেটির ভারি অহঙ্কার হয়েছে।—যাগ্‌গে। ভাত ছড়ালে কাগের অভাব কি।"

এবং "ওর মত ঢের মিলবে।" (৩য় অংক)

—পূর্বাপর কর্মের অসঙ্গতিতে চরিত্রটি অটলের integrity লাভ করতে পারে-নি। এছাড়া প্রেমালিঙ্গিণীর উক্তিতে কুমুদিনীর ছায়াপাত লক্ষ্য করি,—

প্রেম। "...একদিনের জন্যে ত সুখি হতে পেলুম না। যেদিন চক্ষে জল না ফেল্‌বো সে দিনই নয়। সধবা হয়ে কি এত যন্ত্রণা প্রাণে সয়? বিধবারা

একাদশী করে পারণ করেও সন্তুষ্ট হয়, আমার চিরকালই একাদশী, কোন কালে পারণ হল না,…"

মদ্যাসক্তি, বেশ্যাসক্তি ও স্ত্রী স্বাধীনতার বিকৃতিকে অবলম্বন করে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২) প্রহসনটি রচিত। প্রহসনের সংলাপে তেমন ঔজ্জ্বল্য নেই। মত্ত অবস্থায় পূর্ণচন্দ্রের উক্তিতে দীনবন্ধুর অস্পষ্ট ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়—

"মাই ডিয়ার ডার্লিং, কি বিষয় তুমি লেকচার দিচ্ছ বাবা? মদনমত্ত হয়ে এসেছ, এই বলছ? মদনমত্ত হয়েছ, বেশ কথা। আমি তোমার তো মদনমোহন রয়েছি।"

অথবা,

"মাতাল! ছেলেবেলায় ব্যাকরণ পড়েছিলেম।—আঁ্যা একটা সন্ধি করব? মাতাল। মাতা ছিল আল—অর্থাৎ যে জিনিসের দ্বারা মাথা আল হয়, রোশ্নাই হয়। আর তাহাই যিনি পান করেন, তিনি কি? না মাতাল (হাস্য) হা হা হা হা! হ্যা ডিয়ার, মদ খেলে কি কখনো পাপ হয়, স্যান্‌জার কাছে এতদিন লেকচার শুনে কি শেষে এই বিদ্যে হল?" ১/১ গর্ভাঙ্ক।

উদ্ধৃতাংশে নিমচাঁদ ও নদেরচাঁদের কথাবার্তার মত কিঞ্চিৎ বৈদগ্ধ ও স্থূলতা অনুভব করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দীনবন্ধুর প্রহসনের বিকৃতিকে যতখানি অনুসরণ করতে পেরেছেন গুণগুলিকে ততখানি অনুকরণ করতে পারেননি। তাছাড়া, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেশব সেনের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে'র নববিধান ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষয়কে কটাক্ষ করে এই প্রহসনটি রচনা করেছিলেন।[৮] প্রহসনটি একটি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফসল। সুতরাং এখানে উচ্চাঙ্গের নাট্যরস আশা করা বৃথা।

শৈলেন্দ্রনাথ হালদার 'কলির সঙ' (১৮৮০) নামে এক প্রহসন রচনা করেছিলেন। কলিকালের ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকৃতি প্রদর্শিত হয়েছে গোপালের মধ্যে। বেশ্যাসক্ত ও দুষ্কৃতকারী এই পুত্রকে শাসন করা স্ত্রৈণ পিতা বেহারীলালের কর্ম নয়, কেননা স্ত্রীই গোপালের মাথাটি খেয়েছেন। গোপালের কথাবার্তায় অটলের কথা মনে পড়ে। বাবার কাছে শ্বশুরকে উপস্থিত থাকতে দেখে সে বলে,—

"এই যে মশায়, বাবার কাছে বসে খুব লাগান হচ্চে যে।" পুত্রের দুর্ব্যবহারে বেহারী পুত্রকে ভর্ৎসনা করেন,—

"তোর পড়ার মুখে ছাই, তোর মুখে ছাই আর তোর চোদ্দ পুরুষের মুখে ছাই, একেবারে গোল্লায় গেলি!" প্রত্যুত্তরে গোপালের উক্তি,—"যত গালাগালি দিতে পারেন দিন, মার কাছে গিয়ে যখন বল্‌বো তখন টেরটি পাবেন, বুড়ো বয়েসে বে করা কেমন সুখ।"

মদনমোহন মিত্রের 'মনোরমা নাটক'-এর (১৯৯৩ শকাব্দ) দ্বিতীয় অঙ্কটি 'সধবার একাদশী'র আদর্শে পরিকল্পিত। দৃশ্যটি—"বিনোদবাবুর বৈঠকখানা—উন্মত্তাবস্থায় হরি ও মন্মথ আসীন।" হরিহর ও মন্মথ যথাক্রমে নিমচাঁদ ও অটলের অসার্থক অনুকরণ। হরিহর (চুনিলাল ঘোষের জনৈক পারিষদ্) কথাবার্তায় অনেকটা নিমচাঁদের ধার ঘেঁষে গেছে কিন্তু নিমচাঁদের বৈদগ্ধ্য তাতে নেই। নিমচাঁদ ইংরেজীতে আত্মস্থ, পক্ষান্তরে হরিহর,—

> "ইংরিজি কি সাধ করে পড়িনি; পড়ে কি হবে বল্ দেখি। যত শালা এমে বিয়ে অবধি দশটাকার জন্য লালায়িত, আবার শালাদের চলন দেখে কে? এদিক্ নেই ওদিক্ আছে, ঘরে হাঁড়ি নড়ে, মাগ মরেন কাট্‌না কেটে কিন্তু শালারা যেন সিরাজদ্দৌলার পুষ্যিপুত্র, গরবে পৃথিবীতে পা পড়ে না; লাকটাকার চেলে চল্‌তে চান! এই তুই বাবা এতকাল ইংরিজি পরিচিস্ কি করিচিস্ বল্ দেখি। ভাগ্যি বাপের বিষয় ছিল, এই সিন্ আজ দশজন ইয়ার নে সুখে কাল কাটাচ্চিস, না হলে কি হতো বল্ দেখি?"

হরিহর নিমচাঁদের অপকৃষ্ট সংস্করণ। নিমচাঁদ স্বর্গভ্রষ্ট কিন্তু স্বর্গের স্মৃতি তার আছে। হরিহর ঠিক এর বিপরীত—আলোক সে দেখেওনি, দেখতে চায়ওনি। নিতান্ত তামসিকতাই তার জীবন সাধনা।

> হরি। "যে মদের মধুর আস্বাদ পেয়েছে, তারে আবার ইংরিজি পড়ে মন প্রশস্ত কত্তে হবে? এতকাল কি পয়সা নষ্ট করে ঘোঁড়ার ঘাস কাটলি?"

মূর্খামি সত্ত্বেও এর সংলাপে কখনও কখনও নিমচাঁদের বাগ্‌ভঙ্গি ফুটে ওঠে,—

> "বাবা এ ইংরিজি পড়ার কর্ম্ম নয়, কিতেবদি বুদ্ধির কাছে ব্রহ্মা বিষ্ণু অবধি হার মেনে যান, তা তুইত কোন ছার আছিস। তাই বলি বাবা মদ খা, সব হবে এখন। এতে না হয় এমন কাযই নেই।"

চুনিলাল ঘোষকে মেয়েমানুষ সাজানোর প্রস্তাবে হরিহর নিমচাঁদের অনুকরণে একটি প্রশস্তি রচনা করে ফেলে,—

> "হে রতিদর্প দলনে! খঞ্জন-নয়নে! করি-গর্ব্ব-খর্ব্ব-সর্ব্ব-দর্শনে!

পেচক-মুখশশী-বিনিন্দিত-বচনে! কালাচাঁদি! একবার আড়্নয়নে চাও মা, দেখে তোর কালাচাঁদের প্রাণটা ঠাণ্ডা হোক।"

দীনবন্ধু যে জীবন সত্যকে 'সধবার একাদশী'তে প্রকটিত করেছেন, মদনমোহন তেমন কোন জীবন সত্যকে রূপায়িত করতে পারেননি। বস্তুত, দীনবন্ধুকে যাঁরাই অনুকরণ বা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরাই দীনবন্ধুর বহিরঙ্গ রূপের অনুসরণ করেছেন, অন্তরঙ্গ রসের অনুধাবন করতে সমর্থ হননি।

গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' নাটকের অঘোর চরিত্রের সঙ্গে নিমচাঁদের একটা আপাত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বাউণ্ডুলেপনা উভয় চরিত্রের আপাত সাদৃশ্যস্থল। কিন্তু নিমচাঁদের শাণিত ব্যক্তিত্ব অঘোরের মধ্যে দুর্লভ। নিমচাঁদ উনিশ শতকের নব্য-বঙ্গের অস্থির যুব সমাজের প্রতিনিধি। তার বিদ্যা-বৈদগ্ধ্য অননুকরণীয়। ইংরেজী প্রায় তার মাতৃভাষার মত। এতদ্‌সত্ত্বেও নিমচাঁদ জীবনের মধুর রসে বঞ্চিত। সমকালীন নব্যবঙ্গের সকল বিকৃতির তীব্র হলাহল গলাধঃকরণ করে সে নীলকণ্ঠ হয়েছে। নিমচাঁদের ব্যক্তিত্ব বিদ্যা-বৈদগ্ধ্য আমাদের মনকে যেমন চমকিত করে, তেমনি তার পতনও আমাদের মনকে বেদনাতুর করে। কিন্তু অঘোর মিত্রের চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারেই অনুপস্থিত।

'সধবার একাদশী'র ২/২ গর্ভাঙ্কে কেনারাম যখন নিমচাঁদকে তার বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করে তখন নিমচাঁদের সসংকোচ উত্তরে স্বীয় দুর্দশা সম্পর্কে বেদনা ধ্বনিত হয়েছে। পক্ষান্তরে—

অঘোর। "ধরনীবাবু! আমি 'স্বনামা পুরুষো ধন্য।' শ্বশুরের নামে বিকুতে চাই নি। সে পরিচয় দেন তো তা হ'লে সটকাই"। ৫/১

অঘোর মিত্রের এই উক্তিতে ব্যঞ্জনার অভাব। সে তার বাউণ্ডুলেপনার যে ইতিহাস নিজমুখে ব্যক্ত করেছে তাতে তার এই অহমিকা নিতান্তই অর্থহীন বলে মনে হয়।

অঘোরের কীর্তি অনেক। সংসার বাক্স ভেঙে পালিয়ে যাওয়া, 'দাঁদের তবিল ভাঙা, দুটি একটি ঘড়ি মেরামত ক'রে দেব বলে বিক্রমপুর পাঠান, এমনি সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম' অনেক কীর্তির নায়ক সে। নাট্যাংশে দারোয়ানের বাক্স ভেঙে দশটাকা চুরি, ছলনা ও ধাপ্পাবাজি, এমনকি অশালীন প্রলোভন প্রদর্শন করেও টাকা সংগ্রহ করতে দেখি তাকে। নিজের স্ত্রী (সুশীলা) সম্পর্কে হীনতম ইঙ্গিত করে (রক্ষিতা করে রাখবার ইঙ্গিত) খুড়শ্বশুর নবকে দিয়ে কামাসক্ত মোহিনীকে প্রলুব্ধ করবার পরিকল্পনাও অঘোরকে করতে দেখি। শুধু তাই নয়, নবর কাছে নিজের সতী সাধ্বী স্ত্রী সুশীলা সম্পর্কে তার মন্তব্য,—

"সেদিন যখন তোমার মুখে প্রেয়সীর কথা শুনলুম, ভাবলেম, যেমন আর পাঁচ বিধুমুখী, আমার বিধুমুখীও তেমনি···কি জান বাবা, বিধুমুখীদের যখন সোয়ামি মরে, তখন মাছের শোকেই হোক, আর সোয়ামির শোকেই হোক, খানিক উপুড় হয়ে পড়েন, তারপর চিনি পানা মুখে দিয়ে উঠে বসেন, তারপর দিন দিন প্রবল শোকে ফুলতে থাকেন···যেমন রাগে ফোলেন, তেমনি অনুরাগে ফোলেন।" এই হীন মন্তব্য করেই যখন সে আবার বলে,—

..."শুনে আমার প্রাণটার ভিতর সমস্ত রাত তোলা পাড়া করছে যে, বুঝি বা দুর্মতি ছেড়ে এই স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে পারলে সুখী হতেম।" ২/৩

তখন তার এই খেদোক্তি আমাদের মনে করুণার চাইতে জুগুপ্সাই জাগিয়ে তোলে বেশী। নিমচাঁদের সঙ্গে এসব দিক থেকে অঘোরের কোন তুলনাই চলে না। নিমচাঁদ ঘোরতর মত্ততায়ও প্রেমময়ী স্ত্রীর সকরুণ দৃষ্টিকে বিস্মৃত হতে পারেনি। সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি নিমচাঁদের সশ্রদ্ধ মনোভাব তাকে নরকস্থ অমৃতের পুত্রে রূপান্তরিত করেছে। বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি কোন হীন মন্তব্য দূরে থাক, নিজের অধঃপতনের জন্য তাঁরাও যে আজ কত বেদনার্ত, নিমচাঁদ তা মত্ততার মধ্যেও স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে। এমনকি প্রেমময়ী স্ত্রীর কথা স্মরণ করে নিমচাঁদের আবার সুস্থ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। নিমচাঁদের আত্মসমীক্ষা অশ্রুসিক্ত, পরিবেশের কূটপাকে আবদ্ধ এক অসহায় মানবাত্মার মর্মান্তিক হাহাকার।

অনুশোচনা অঘোর মিত্রেও আছে কিন্তু তাতে নিমচাঁদের বেদনার গভীরতা নেই। ৩/২ গর্ভাঙ্কে চুপিসারে সুশীলাকে দেখতে এসেছে অঘোর। কুঠির মধ্যে যখন সুশীলা পতিসেবায় বঞ্চিত হয়েছে বলে আপন মনে কথা বলে চলেছে তখন নেপথ্যে জানালার বাইরে থেকে এমন পতিব্রতা পত্নীকে নিয়ে ঘর করা গেল না বলে অঘোরকে দুঃখপ্রকাশ করতে দেখি কিন্তু তার এই দুঃখের গভীরতা অতলান্তিক নয়, নিতান্তই হঠাৎ পাওয়া।

মাঝে মাঝে আত্মগোপন করার তাগিদে সে বেশবাস পাল্টিয়ে হেটো মেঠো বুলি ঝাড়ে। তার নিজের কথাতেই প্রকাশ,—

"কীর্ত্তিত কিছু কম হয় নি, দরওয়ানের বাক্স ভাঙা থেকে আর অন্ধ নাচার থেকে সমান টানে বয়ে আসছি। কোট-পেনটুলুনের বড় জবর পর্দা বাবা, এতে অনেক দাগাবাজী ঢাকা যায়, আর ওর সঙ্গে যদি ভেরি গ্ল্যাড, ভেরি সরি ডোণ্ট মেন্সান এমন দুচারটে বুকনি ঝাড়া যায়, তাহলে বাবাজীকে বাবাজী, তরকারীকে তরকারী; তাহ'লে জুচ্চুরিও চলে, অনারেবলও হওয়া যায়।" (৩/৩)

এ যেন চরিত্রের মধ্যে নিমচাঁদের তুলনা করতে বসা বৃথা। ভাব-ভাষা, কায়দাকানুন, শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি-প্রকৃতি কোন দিক থেকেই নিমচাঁদের সঙ্গে এঁদের চরিত্রের সাদৃশ্য নেই। তবু এই দুটি চরিত্রের বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা করা হল, কারণ, কোন কোন সমালোচক মনে করেন -

> এই চরিত্রটি যেমন হাসির উদ্রেক করে, তেমনি আমাদের সমবেদনার অশ্রু ও সঙ্গে আকর্ষণ করে। যে বাস্তব জীবনধর্ম নিমে-দত্ত চরিত্রকে জীবন্ত করিয়াছে, সেই জীবনধর্মই এঁদের চরিত্রকে উজ্জ্বল রূপ দান করিয়াছে।" ১

গিরিশচন্দ্রের কোন কোন নাটকে বাউণ্ডুলে 'উনপাঁজুরে-বরাখুরে' চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। এ জাতীয় চরিত্র দুটির আদর্শ গিরিশচন্দ্র স্পষ্টতঃই দীনবন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছেন। 'বলিদান' নাটকেও এমনি একটি বাউণ্ডুলে চরিত্র আছে। এই নাটকের দুলাল একটি আস্ত 'বজাত'। খোঁড়া, কুঁজো, কুৎসিত দর্শন এই চরিত্রটির মধ্যে সম্ভবতঃ 'রেটিংপট' এর ক্যালিবানেরই তুলনা চলে। হিংস্রতা ও লালসার কুটিলতাকে আবদ্ধ দুলাল চরিত্রে গিরিশচন্দ্রের একটি অসম্ভব সৃষ্টি। অবশ্য এ জাতীয় অস্বাভাবিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে খুব কম নেই। ক্যালিবানের হিংস্রতা ও পাশবিকতার সঙ্গে পিম্পনেও একটা যুক্তি আছে কিন্তু কাঙালী বা জগদম্বা, রমেশ, মোহিনী, পূর্ণানিধি, ঘাঁচি, দুলাল, রূপচাঁদ, রঘুনাথ প্রভৃতির নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা এতই আরণ্যক যে, একমাত্র নরখাদকরাক্ষসদের মধ্যেই এঁদের কিছু সমজাতীয় তুলনা সম্ভব।

দীনবন্ধুর প্রতিভার ব্যাপকতা যেমন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির স্তরবৈচিত্র্য উদ্ঘাটনে সহায়তা করেছে তেমনি তাঁর সর্বব্যাপিনী সহানুভূতি এমন সব ঘৃণ্য ও 'পতিত' চরিত্রগুলিকেও আবৃত করেছে। মানুষ কখনও শুধু ভাল বা শুধুই খারাপ হয় না। নিতান্ত ধূর্ত ও

ক্ষতের নিভৃত কোণে যে স্পর্শকাতর কোমল স্থানটুকু থাকে তাকে আবিষ্কার করতে হলে সেই মানুষটির ক্ষতের ক্ষুদ্রপুরে প্রবেশ করবার পরিশ্রমটুকু স্বীকার করতেই হবে। তা না হলে মানুষটির সমগ্র নয়, শুধু একটি দিকের পরিচয়ই আমরা পাব, সম্পূর্ণ ব্যক্তিটির নয়।

দীনবন্ধুর সাধনি দৃষ্টিই তাই জীবনের পঙ্কিলতার মধ্যেও পদ্মের সন্ধান পেয়েছে, পরবর্তীকালের অনেকের সামাজিক নাটক প্রহসনেই যার নিদারুণ অভাব। সামাজিক নাটক রচনা সম্পর্কে 'উপন্যাস'ই মানব জীবনের সত্য সন্ধান থেকে গিরিশচন্দ্রকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। দু'একটি চরিত্রে অবশ্য শেষ পর্যন্ত যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করি না এমন নয়, কিন্তু সে উদ্বোধনও এমনই আকস্মিক যার মধ্যে কার্য-কারণের যোগাযোগ খুবই কম। 'বলিদানে'র দুলাল এ ধরণের চরিত্রের অন্যতম দৃষ্টান্ত। দুলালের মধ্যে কেউ কেউ নিমচাঁদের ক্ষীণ প্রতিভাস লক্ষ করেছেন। ১০ কিন্তু চরিত্রটির আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে এই অভিমত মেনে নেওয়া যায় না। নারীলোলুপ, আমুদেপনা এবং অতি বিকৃত রুচির এই চরিত্রের মধ্যে নিমচাঁদের তুলনা দিতে যাওয়া বৃথা। বাবা মায়ের কাছে উমতের মত নিজের নারীলোলুপতার ও আমুদেপনার কথা ব্যক্ত করা ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য এই চরিত্রে নেই। নিমচাঁদের মদ্যপতা তাকে অর্জিত করে নি। মদ্যপতা সত্ত্বেও নিমচাঁদের একটি সংস্কৃতিবান মনের পরিচয় পেতে আমাদের কষ্ট হয় না। কিন্তু এ সংস্কৃত দুলাল তার বাহ্যরূপে নয়, রুচিতেও কুৎসিত। নাটকের একেবারে শেষে এই চরিত্রে জোবেদা-পত্নীর প্রভাবে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটেছে কিন্তু তা এতই আকস্মিক যে, চরিত্রের ভাব পরিবর্তনের জন্য আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষার যে প্রয়োজন আছে তা এখানে অনুপস্থিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্র দু'খানি সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন। এ সামাজিক নাটক রচনায় তিনি গিরিশচন্দ্রের আদর্শকেই অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সামাজিক ~~নাটক~~ নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের ~~আদর্শকেই~~ যেখানে সীমাবদ্ধতা, দ্বিজেন্দ্রলালও সেখানে ত্রুটিমুক্ত হয় নন।

অন্য ভাবিক পরিস্থিতিকে অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সামাজিক নাটকের কায়া গঠন করবার চেষ্টা করেছেন। সামাজিক বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব তিনি পূরণ করতে চেয়েছিলেন কতকটা গিরিশচন্দ্রের মতই পূর্বসূরীদের ভাণ্ডার থেকে উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করে। দীনবন্ধুর নাটকের ক্ষেত্রেও তাই দ্বিজেন্দ্রলালকে দু'একবার পদচারণা করতে হয়েছিল।

'পরপারে'(১৩১১) নাটকের কালী চরণ নিমচাঁদের প্রথম অনুকরণ। এক নিষ্কর্মা ব্যক্তি হিসেবে কালী চরণের পরিচয়। নিষ্কর্মা হলেও তার বিদ্যা বুদ্ধি আছে। বিদ্যা-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও নিমচাঁদ যেমন এটর্নের ইয়ার। কালী চরণও তেমনি পার্বতী চরণের(মহাজন) জন্য তম অনুপাত্র। পার্বতী চরণের সঙ্গে স্থানে-অস্থানে, দুষ্কর্মে সকলের সঙ্গে সে একত্রে অবস্থান করেছে। কোন ক্ষেত্রেই তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটতে দেখি না। নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে এই চরিত্রের সামান্য তম যোগও নেই। এ ধরণের পটভূমিকায় একটি তোমাকির তুলনা যেমন আপনাতে আপনি সর্বস্ব তেমনি এই নাটকে কালী চরণও শুধু তাৎপর্যহীন শানিত কতক বাক্যছটার চমক সৃষ্টি করবার জন্যই সংযোজিত। নিমচাঁদকে অনুকরণ করতে গিয়ে সে মাঝে মাঝে অনর্থক ইংরেজীর ব্যবহার করেছে, যেমন, -

পার্বতী - এই হতভাগাটা আমার বাড়ী বেয়ে ঝগড়া করতে এসেছে - বলে যাবো। - এসো না, (আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে) আয় না দেখি, পাজী।

কালী - Why পার্বতী, this is worse than quixote. Don Quixote গিয়েছিলেন যুদ্ধ করতে wind mill - এর সঙ্গে। কিন্তু তুমি যাচ্ছ যুদ্ধ করতে - wind - এর সঙ্গে(১১৩)।

কথায় কথায় দোক্তা কাটার মত এমন তাৎক্ষণিক উদ্ধৃতি ব্যবহার করা কালী চরণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য -

পরেশ - দরকার হয়ত হাটে একথা চেঁচিয়ে বলতে পারি। তাই চাও?

কালী - "Tell it not in Gath; publish it not in the streets of Askelon "(১১৯)।

মদের প্রভাবে একটি সংভাবনা কি ভাবে ভাল পরিবারের ভাল পরিবেশ নষ্ট করে দেয় নিমচাঁদ তারই দৃষ্টান্ত। নাট্যকার উদ্দেশ্যমূলক নাটকের নিমচাঁদকে শক্তিমান করে আঁকেন নি। 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তাঁর মদ্যাসক্তিও নাটকের মূল বক্তব্যের অনুসারী। কিন্তু কালী চরণের -

"ওহে। Give me a glass of liquid fire- distilled damnation."

- উক্তি শুধুই মদ্যাসক্তির নিদর্শন।

আশ্চর্যের বিষয়, ডিকেন্সের মত একজন শক্তিমান নাট্যকার এমন একটি উদ্দেশ্যমূলক চরিত্র সৃষ্টি করলেন কি করে? আরও আশ্চর্য, এই চরিত্রটি নাটকের প্রায় আগাগোড়া বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উপস্থিত হয়েছে বহু উক্তি করেছে কিন্তু তার উক্তিতে কোন চরিত্রই প্রভাবিত হয় নি, এমনকি দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া তার উক্তির যৌক্তিকতাটুকুও কেউ দেয় নি। ফলে উপন্যাসে কালী চরণ যখন তার ইংরেজী বিদ্যা জাহির করেছে তখন এই চরিত্রের স্বাভাবিক মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। বস্তুত, 'পরপারে' নাটকের কালী চরণ যেমন কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করেনি তেমনি 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের সার্থক প্রতিরূপ হতে পারে নি।

বিশ্বিমচন্দ্র-প্রবর্তিত পরিবেশে পরিবর্তিত 'বেঙ্গলী বাবুর'(১৮৮৭) নাটকাটিতে যাদুনাটের দালাল দোকড়িমল বাবুর হিতৈষী কথা বার্তায় ও মেজাজের দিক থেকে যেমন 'সধবার একাদশী'র রামমাণিক্যের প্রতিচ্ছবি মাঝে মাঝে ফুটে তেমনি বিদ্যাবত্তায় ভোলাচাঁদের অসম অনুকরণ।

রামমাণিক্য বাবুর, বিক্রমপুরের অধিবাসী এই ব্যক্তিটি কলকাতায় এসে যতই কলকাতাই হওয়ার সাধনা করুক না কেন, বাবুর প্রতি তার উক্তি থেকে থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দোকড়িও বাবুর কিন্তু

এই চরিত্রে রামমাণিক্যের চমক নেই, এমনকি তার 'বার্ণলেস্ক' সুরভার অভাব আছে। অপাতসদৃশ দুটি উক্তি উদ্ধৃত করলেই চরিত্রদুয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য অনুধাবন করা যাবে।

রামমাণিক্য -"পুঁথির মধ্যে পুতুকেডা। হিটকাইচেন আর ঝ্যালাইবার লাগচেন - দ্যাশে হইতে, প্যাটে পারা দিয়া জিহ্বা ডা টানে বাইর করতাম, আর অমাবস্যা দেহতেন - যা লা গর্ত্তাব, হুয়ার, বন্ধুক, বুত'। সং ৯।২।

দোকড়ি - "হুজুর, খবর দিলাম আর বলেন আমি যারা মজাদা? বরাৎ বরাৎ কলিতে ধর্ম নাই। ..... হালারা আমারেই জরে, আচ্ছা দেখছি, আমি কেমন বাঁশ দেখমু। হালারে আমি দিলাম ঝাড় ঝুটায়ে পুটায়ে, আর আমারেই দেখাও কল, দেশ হইলে হালারে বাঁশ দিয়া পিটা করতাম। ভগবান দেবেনই সুবিধা করে, ..." বে.বা. ১।৫।

নির্বোধ ভোলাচাঁদ 'সধবার একাদশী'র একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। ইংরেজী তে ছাড়া ইনি একবারেই কথা বলেন না। প্রতিটি কথায় 'সার' 'সার' করে বিনয় প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব(মুদ্রাদোষও বটে)। ভোলাচাঁদের ইংরেজীর নমুনা -

"আই আইন ইউ সার্, আই আইন ইউ সার্, হোয়ের ইউ গো আই গো, আন্ ইন্‌লা আইন লাদার ইন্‌লা, আই আইন ইউ সার্।"

এমন ভোলাচাঁদও একটি দুরূহ বাংলা বাক্যের মোটামুটি ইংরেজী তর্জমা করে কেনারামের গর্বখর্ব করে নিমচাঁদের 'বাহবা' পেয়েছে। পক্ষান্তরে দোকড়ির ইংরেজীর দৌড় 'ইয়েস সার্, ভেরী গুড্' পর্যন্ত যেমন,

"ইয়েস স্যর, ইউর স্যারেক্ট স্যর। ওয়াইন অণ হিয়ার নট মাটার ইট ওয়াইন ? কোম্ গার্ডেন, বেরী নিয়ার, দিস্ মোর রিটারণ। ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, স্যাম্পেন, আল্, আল্, পটল, কাটলিস্, মটন ছাগল, এভরি এভরি, ঐ ঐ কোম্, গার্ডেন কোম্ মাই ব্যাক, ব্যাক মি, নট বিট ব্যাক থেকে কোম।"

১।৬।

উদ্দেশ্য বাঙ্গ দোকড়ির সঙ্গে নির্বোধ ভোলাচাঁদের এই বাহ্য সাদৃশ্য টুকু ছাড়া, কোন গভীরতর মিল নেই।

চুনিলাল দেবের 'ফটিক চাঁদ'(১৮৯৮) প্রহসনে বাবুর আত্মকথায় বাবুয়ানার দ্রব্য সামগ্রীর বর্ণনায় ভোলাচাঁদের বেশবাসের(দ্রষ্টব্য নিমচাঁদের বর্ণনা) প্রভাব আছে। ফটিকের পুত্রদ্বয়ের গানের কথাগুলি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য -

চৌমুড়ি হাঁকিয়ে যাব সঙ্গেতে ইয়ার।
কালা নেড়ে ইউনিফরম্ ফেট্টা চাদর চুলটদার।
বেলদার জামা গায়ে বল মুদিয়ে পায়ে
ফুলতোলা সিল্ক মোজা, সিল্কের গাটার,
হীরে পান্নার আংটি হাতে, বুকে চেনের কি বাহার।
মুক্তোর গোড়ে গলায় দিয়ে, এক্স মাথা রুমাল নিয়ে।
ব্রুশ কাট টেরী মাথায়, চালাবো নেভেন্তার
চলবে বুলী মজাদারী উড়বে খালি বোতল নিকার।"

'সধবার একাদশী' পতিব্রতা কুলললনাগণের দুঃখের কাহিনী। ঘরে যাদের সুন্দরী পতিব্রতা স্ত্রী বর্তমান তারাই কেবল সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হয়ে ইয়ার - বোম্বাদের নিয়ে মদ ও বারবণিতায় আসক্ত। অটল, নিমচাঁদ, ভোলাচাঁদ, রামমাণিক্য প্রভৃতিরা অনিবার্য ধ্বংসের স্রোতে গা

ভাসিয়েছে। কোথায় চলেছে তা এরা জানে না। স্বামীর অঙ্কশয়নে এদের স্ত্রীগণ ব্যথিতা, স্বামীর প্রত্যাগমন আশায় প্রতীক্ষারতা। কিন্তু স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেমময় প্রাণপতির পত্যাগমনে এঁদের লহরীর প্রতীক্ষা কখনও ক্ষণেক বক্ষঃ সৌরভে সুবাসিত হয় না।

'সধবার একাদশী'তে এঁরা সকলেই রয়েছেন পশ্চাৎপটের ওতরালে। এঁদের ঐক্যবেদনার মূর্ত রূপ নাট্যকার একটি চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কুমুদিনী এইসব উপেক্ষিতা পতিব্রতাগণের প্রতিনিধি। তবুও একটু পার্থক্য আছে। কুমুদিনীর চরিত্রে বাঁচার আছে, অসহ্য ফন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আকাংক্ষায় কুমুদিনীর অস্থিরতা বারবার প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি নারীত্বের চরম লজ্জার হাত থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে চকিতে নিজের বৈধব্য কামনাও আছে। কিন্তু সবাই কুমুদিনী নয়। ভোলাচাঁদ, নিমচাঁদ, রামমাণিক্যের স্ত্রীদের আমরা সঙ্গে দেখিনা। পুরুষ চরিত্রগুলির কথায়বার্তায় তাদের ওতঃপুরিকাগণের আভাষ পাই।

মত্ত অবস্থায় নিমচাঁদ নিজের অঙ্কশয়নে স্ত্রীর অবস্থা পর্যালোচনা করেছে -

> "আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্য তার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কলঙ্কিত হই, কিন্তু সুধাংশুবদনী আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুনতে হয় বলে কারো কাছে বসেন না ..... ইত্যাদি।" ৩।২।

এমন একটি চরিত্র সর্বদা আমাদের দৃষ্টির ওতরালেই থেকে গেল। ওতরালবর্তিনী নিমচাঁদের পতিব্রতা স্ত্রীকেই যেন গিরিশচন্দ্র পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে ধরেছেন। তাঁর বলিদান নাটকের মোহিত-মোহন অতি জঘন্য চরিত্র। ঘটকের চাতুরীতে এই অপদার্থের সঙ্গে করুণাময় বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা কিরণময়ীর বিবাহ হলো। কিন্তু বিবাহের পর এক মুহূর্তের জন্য কিরণময়ী স্বামীর স্নেহ ভালবাসা পেল না।

বরং প্রতিনিয়ত পাশ্চাত্য পঙ্কিলতা ও দৈহিক লিপ্সা এবং স্ত্রীর উপেক্ষাও কটূক্তি ভোগ করতে হয়েছে। নরকযন্ত্রণার থেকে করুণাময়ী মেয়েকে তুলে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। কিরণময়ী প্রথম প্রথম ঘৃণিত জন্তুর করলেও ধীরে ধীরে তার উপলব্ধি হয়েছে যে, স্বামীই নারীর একমাত্র আশ্রয়। ২।৪ পঙ্‌ক্তিতে জোবির সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে অতি দীর্ঘ সংলাপে বিস্তারিত ভাবে সে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছে তার সঙ্গে নিমচাঁদের স্ত্রীর প্রতিপত্তির সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট।

স্বামী স্ত্রীর একটা অস্থায়ী প্রভাব কখনও কখনও নিমচাঁদের উপর পড়েছে। দাম্পত্য জীবনাধার সুখ দুঃখের সংসারের আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মনের কোণে উঁকি দেয়। স্ত্রী থাক বা অন্য যে কোন ভাবেই থাক, অন্তিমে নিমচাঁদের পরিবর্তন হয়েছিল কিনা, দীনবন্ধু তা আমাদের জানান নি। মোহিত মোহন কিন্তু পরিবর্তিত হয়েছিল। সুশীলার প্রভাবে যেমন অঘোরের পরিবর্তন হয়েছিল, তেমনি কিরণময়ীর প্রভাবে প্রমদার্থ মোহিতেরও ~~[illegible]~~ চৈতন্যোদয় হয়েছিল। 'বলিদান' নাটকের বয়াটে চরিত্রগুলি অবশ্য শেষপর্যন্ত নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, সে পরিবর্তন সব ক্ষেত্রেই যুক্তি সম্মত কিনা সে প্রশ্ন আপাততঃ স্থগিত রাখাই ভাল।

...

(৬)

'নীলাবতী' নাটকের হাবলহুরে হাপ পাড়াপেয়ে' হেমচাঁদ চরিত্রটির দ্বারা পরবর্তী বাংলা নাটকের অনেক চরিত্রই প্রভাবিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য মনোমোহন বসুর 'প্রণয় পরীক্ষা' (১৮৬৯) নাটকের নটবর চরিত্রটি। সুশীলার স্বামী নটবর হেমচাঁদের আদর্শে

রূপায়িত। শুনি এবং আঁখি সেবন এবং ঝুমুর ইত্যাদি দলের সংস্রবে তার অধঃপতন ঘটেছে। সুশীলার মত সাধ্বী স্ত্রী থাকতেও ঘরে তার মন নেই। নটবর ছাড়াও সরলতা ও সুশীলা চরিত্রদ্বয়ের সঙ্গে 'লীলাবতী'র যথাক্রমে 'রাজলক্ষ্মী ও শারদাসুন্দরী' চরিত্রদুটির স্বভাবগত সাদৃশ্য ও দুর্লক্ষ্য নয়। রাজলক্ষ্মী ও শারদা পরস্পর সহোদরাও সখী, এবং রাজলক্ষ্মী শারদার শুভানুধ্যায়িনী। এখানেও সরলতা ও সুশীলা পরস্পর ভাতৃবধূ ও ননদ সম্পর্কে, অধিকন্তু এরা সখী। সম্পর্ক কল্পনার দিক থেকে মনোমোহনের নাটকে সরলতা ও নটবর চরিত্রের অন্তঃ কথোপকথনের সূত্রে সৃষ্ট নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে ও মনোমোহন দীনবন্ধুকে অনুসরণ করেও যৎকিঞ্চিৎ মৌলিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন।

নটবরের কথাবার্তায় ও আচরণে হেমচাঁদের প্রভাব সুস্পষ্ট। ১।৩ গর্ভাঙ্কে সরলতার সঙ্গে নটবরের কথোপকথনের কিছু অংশ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে -

সর - তুমি আর আড্ডায় আড্ডায় যেও না যেন।

নট - যাব না তো কোথায় যাব - বেশ্যসভায় যাব বুঝি? হাঃ হাঃ হাঃ

সর - তাই তো প্রার্থনা।

নট - বেশ বলেছ। তোমার কথায় বাপ পিতেমোর নাম ডুবুই - বামনাই ছেড়ে মোপলাই ধরি - তা হ'লেই হয় আর কি?

.....

সর - তা এতে যে তোমার নিন্দে হয়।

নট - নিন্দে করে কে?

সর - সকলেই করে - ঠাকুর্ঝিও কত কাঁদে।

নট - উনি এমি নেখাপরাজ্ঞই বটে, আমি নাকি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান হ'লে কুলে জেই ওঁরে বে করেছি, আর ওঁর জন্যে নাকি কত লোকের কত মাথা পাড়াতেও আর বে বসুমনা, তাই ওর এত গ্যাদা? তবে দেখবে মজা - দেখবে একবার বেরিয়ে গে কটা বে ক'রে আনতে পারি?

ভানুমতিতেও নটবর অনেকটা হেমচাঁদেরই পরিবর্তিত সংস্করণ -

নট - 'বল্লে না ? "বাপের পদাতু" বল্লে, আবার শুদ্ধ কথা কারে বলে ? আমি যেন 'বোধোদয়' বই পড়িনি, যে 'পদাতু' কাকে বলে বুঝতে পারিনে ।

সর - কারে বলে বল দেখি ?

নট - কেন, জুতুকে বলে - তবে বুঝি আমি তোমার চাকুরির জুতু ?

সর - (স্বগত) বড় মিছেও নয়, (প্রকাশ্যে) তা হলেই বা - আর কারুর তো নও - শস্তাপুরুর, তায় দোষ কি ?

নট হিঃ হিঃ আর তোমার সঙ্গে কথা কব না । আবার তুমি ওরে আমার 'পুরু' করে দিচ্ছ ? ও পুরু নোক, না আমি পুরুনোক ? এই বুঝি তোমার বিদ্যে হয়েছে - ইতিই বুঝি সবাই তোমায় ভাল বলে ?

শারদাসুন্দরীর প্রভাবে যেমন হেমচাঁদের চরিত্রশুদ্ধি হয়েছিল, হেমচাঁদের শুদ্ধিতে শারদাসুন্দরী সুখী হয়েছিল । এখানেও সুশীলার প্রভাবে নটবরের স্বভাবে পরিবর্তন ঘটায় সুশীলা আনন্দিত হয়েছে ।

সর - (সুশীলার প্রতি) তবে চাকুরি কেমন আছ বল ?

সুশীলা-তোমার গুণে এখন অনেক ভাল আছি, বড় বাদলার পর ছেয়ানি পেয়েছি ।

সর - (সহাস্য) অপেক্ষা কর, রৌদ্রও পাবে ।

'নীলাবতী'র হেমচাঁদ বয়াটে অবস্থাতেও অশালীনতাকে ঘৃণা করেছে, প্রথমাবধিই অশালীনতার প্রতি তাকে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখেছি । মনোমোহন কিন্তু নটবরের রসাটেপনায় আরেকটু রঙ চড়িয়ে দিয়েছেন । নটবরের উচ্চৈঃস্বরে গান গাওয়া, উরুতে চাপর মেরে ঝুমুর গানের অনুকরণ করা, ডিগবাজী খাওয়া, 'বঙ্কিৎ' প্রভৃতি অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করা প্রভৃতি আচরণ হেমচাঁদে পাওয়া যাবে না । ২।২ গর্ভাঙ্কে মহামায়ার

মহামায়ার দাসী কাজলাকে বেলগাছে উঠিয়ে দোল খাওয়ানো ও প্রহার করার ব্যাপারটিতে নটবরের অসৎ ও বিকৃতমানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উল্লিখিত চরিত্র কটি ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতায় এই নাটকে দীনবন্ধুর প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মনোমোহন পোদ্দারের 'সংসার' নাটকের রমেন্দ্র, প্রতিভা এবং বিনোদ চরিত্র তিনটি যথাক্রমে হেমচাঁদ, শারদাসুন্দরী ও নদেরচাঁদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রতিভা শারদাসুন্দরীর সঙ্গে তুলনীয় হলেও কিছু ব্যক্তিক্রম শালিনী এবং মুখরা, বিনোদ ও নদেরচাঁদের মত আকাট মূর্খ নয়, জ্ঞানপাপী।

রমেন্দ্র হেমচাঁদের মত মূর্খ নয়, তার কথাবার্তায় সামান্য লেখা-পড়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বয়াটে হেমচাঁদ স্ত্রীর উপর নিত্য যতই দুর্ব্যবহার করুক ঘড়ের মাপ যে 'থেমটাওয়ালী' নয়- এমন পরিচ্ছন্ন চেতনা তাকে নদেরচাঁদ থেকে আলাদা করেছে। নদেরচাঁদের সঙ্গে শারদাসুন্দরীকে কথাবার্তা বলার জন্য ~~তাকে~~ পীড়াপীড়ি করার পিছনে কোন অসৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় নেই। পক্ষান্তরে রমেন্দ্র তার বন্ধু বিনোদের সঙ্গে স্ত্রী প্রতিভার পরিচয় করিয়ে দিতে বিশেষ ভাবে আগ্রহী। কারণ,

রমেন্দ্র - তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আমিও ভাবলুম যে, আজ আর যখন মেয়ে মানুষ পাওয়া গেল না - না না না তা নয় - আমি ভাবলুম যে, আমার **friend** - এর কাছে তুমি কি আর বের হতে ~~xxxx~~ আপত্তি করবে না, তাহলে কজনে মিলে আজ রাত্রে বেশ আমোদ করা যাবে এখন।(১।৩)

স্ত্রীর ভ্রষ্ট পতন শারদাসুন্দরীর বেদনার কারণ, তবু সে স্বামীকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, কখনও কটু ~~xxxx~~ বাক্যে তাকে জর্জরিত করে নি। প্রতিভা কিন্তু শারদার মত মুখ বুজে সব সহ্য করতে পারে নি। স্বামীর অসৎ মনোভাবের পরিচয় পেয়েই সে গর্জে উঠেছে -

প্রতিভা - তুমি এতদূর উন্মত্ত হয়েছ, তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে তা আমি জানতুম না। তোমার মান-সম্ভ্রম, লজ্জা শরম কোথায় তুমি রসা করবে, তা না হয়ে, সেই সমস্ত বিষয়ে জলাঞ্জলী [illegible] দিতে তুমি আমায় উপদেশ দিচ্ছো। তোমার লজ্জা করে না? আমি ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের বৌ। তুমি স্বামী হয়ে, কুলের কুলবধূকে, আপন ধর্মাধর্মিণী সহধর্মিনীকে, সামান্য বেশ্যার মত পরপুরুষের সামনে বার করতে চাচ্ছো। তার সঙ্গে আমোদ করতে [illegible] বলছো। তোমার প্রাণে একটুও সংকোচ হয় না। তুমি কোন বংশে জন্মেছ, তা জান? তোমার পিতৃপুরুষদের নাম করলে দিন জল যায়। [illegible] কুল বংশের নাম রাখছো। ছি ছি ছি মদ খেলে লোকে মাতাল হয় জানতুম, এখন দেখছি, মদে মানুষকে পশুরও অধম করে। (ঐ)

এই দৃশ্যেই বিনোদের আগমন ও সংলাপাংশগুলি সহজেই নীলাবতীর ১।২ পর্যায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

বিনোদ - কিহে আমাকে একা বসিয়ে রেখে তুমি যে বৌএর সঙ্গে রসালাপে মত্ত হয়ে আমাকে ভুলে গেলে দেখছি?

রমেশ - এস ভাই, এস। ওকি তুমি যে সেকেন্দারি পদের আড়াই পত্র যোগটা দিয়ে সরে দাঁড়ালে? এই আমার friend বিনোদ, ওর কাছে লজ্জা করতে নেই।

বিনোদ - এমন প্রথম প্রথম হয়।

রমেশ - এস, সরে এস, কথাবার্তা কও। তবু কথা শোনে না। (ঐ)

দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জেনদর্পণে' শিব ও সুন্দর চরিত্রদুয়ের মধ্যে হেমচাঁদ ও শারদাসুন্দরী র বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। শিষ্টা ও সভ্যতায় শিব যেমন হেমচাঁদেরই পরিবর্ধিত রূপ তেমনি পাতিব্রত্যে সুন্দর [illegible] শারদারই পূর্ণতর আদর্শ। উভয়ের সংলাপের এই পরিবেশ এখানে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধার করছি -

শিব - কি বললে পাঁচানী নয় - ওর নামটা কি বল্লে ?

সুর - মৃণালিনী ।

শিব - মৃণালি - ইনি । আমার মধু দাদা বলেছে ওখানি পাঁচালির বাবা, তুমি ও পড়ে কি করবে ? দপ্তরখানায় ধাতাপত্রি লিখবে, মুহুরী হবে ? হা হা হা(হাস্য) ।

সুর - নাথ, আমায় এত ঠাট্টা xxxxxxx করা কেন ?

শিব - আঃ নাথ নাথ করে পাটা জ্বালিয়ে মারলে, আমাকে, আমাকে মারবি নাকি নাথ নাথ আবার কি ?

সুর - আমার ঘাট হয়েছে, আমায় ক্ষমা কর ।

শিব - ঘাট হয়েছে না পিঁড়ি হয়েছে ? যা ঘরে যাই কত রই ই শিখেছেন । আমার বিরাজ কেমন সভ্য, তার বাড়ি যাবামাত্রি বাপান্ত, বসতেই খেংরা, উঠতেই কেঁটা, একি না ঘরে আসবামাত্রি নাথ । নাথ আবার কিরে বাবা । বই পড়ে বুঝি নাথির বদলে নাথ শিখেছ ?

সুর - তোমার মুখে কালিমা পড়লো কেন ? অমন কার্ত্তিকের মত সুন্দর শ্রী বিবর্ণ হয়ে গেল কেন ?

শিব - আমার মুখে মা কালী পড়লো কেন ? আমি কালীর সেবা না করে জল গ্রহণ করি না । তুমি তো জান আমি সকালে উঠেই শিবের আরাধনা, কালীর ভোগ এ সকল না দিয়ে কোন কাজ করি না । আর আগে কার্ত্তিক ছিলেম, এখন ময়ূর উড়ে গেছে বলেই বিবর্ণ হয়ে গিয়েছি ।

'নীলাবতী' নাটকের ২ অংক ১ গর্ভাংকে শারদা সুন্দরী র অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে কটূক্তি করে(বাপান্ত করে) xxx বাক্স থেকে টাকা নিয়ে হেমচাঁদের কলকাতায় প্রস্থান ঘটনাটি পরবর্তী একাধিক বাংলা নাটকে অনুসৃত হয়েছে । যেমন, মদনমোহন মিত্রির 'মনোরমা' নাটকের ৩।২ গর্ভাংকে শ্বশুর মনোরমাকে বাপান্ত করে 'পদাঘাতে বাক্স ভাঙিয়া গহনা হস্তে প্রস্থান', ডাকাধন বিদ্যালংকার প্রণীত 'মুখে না পরল'(১৭৯২খ্রীঃ) নাটকের ৩।৩ গর্ভাংকে শ্বশুর শ্যালিকা র 'পুঁঠে লাথি মারিতে মারিতে', 'পুঁথোর বেটী খাকি' প্রভৃতি xxxxxx গালাগালি দিয়ে 'চাবির থলো লইয়া শ্বশুর বাক্স খোলা ও রত্নচুর লইয়া প্রস্থান', রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'মাতালের জননী

বিলাপ' প্রহসনের শেষাংশে মাকে বাপান্ত ও পদাঘাতে ভূপতিত করে বাক্স নিয়ে হরিশের উধাও হওয়া প্রভৃতি। দীনবন্ধু হেমচাঁদের মধ্যে মানবিকতা বোধের যে ইঙ্গিতটুকু তুলে ধরে হেমচাঁদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিলেন এসব নাটকে তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যাবে না। নদেরচাঁদের মধ্যে একই মুক্তিমন্ত্রের সত্যার্থ হলেও হেমচাঁদের ক্রুদ্ধকরণ তাকে মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ করেছে, কিন্তু হেমচাঁদের অনুকারী এসব চরিত্রে সেই ক্রুদ্ধকরণের অভাবে নদেরচাঁদেরই প্রতিচিত্রে পরিণত হয়েছে।

বিপিনবিহারী সেনগুপ্তের 'হারানিধি' নাটকের অঘোরের স্ত্রী সুশীলার মধ্যে লাবণ্য 'র ক্ষিরোদবাসিনী র একটা সুস্থ সাদৃশ্য আছে। ক্ষিরোদবাসিনীর স্বামী অরবিন্দ দীর্ঘ বারো বৎসর যাবৎ নিরুদ্দেশ। শবরীর প্রতীক্ষা নিয়ে ক্ষিরোদবাসিনী দিন গুনছেন, কবে স্বামী ঘরে ফিরে আসবেন। তিনি শুদ্ধাচারিনী কিন্তু বিধবা নন। অরবিন্দ গৃহত্যাগ করবার আগে যে স্বীকারোক্তি লিখে গিয়েছিলেন তাতে তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত করবার কথা লেখা ছিল - ক্ষিরোদবাসিনী তা জানতেন। একদিন অরবিন্দ প্রায়শ্চিত্ত শেষ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবেন এমন আশা করা ক্ষিরোদবাসিনী র দুরাশা নয়। পক্ষান্তরে, অঘোরের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হওয়ার পর সুশীলা 'বিধবা' হয়। বিধবার সর্ববিধ আচার সংস্কার সে পালন করে। কিন্তু তার মন বলে যে, সে 'বিধবা' হয় নি। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে সে একাদশীতে মাছের আঁশ দাঁতে কাটে, কপালে খড়কে দিয়ে সিঁদুর ছোঁয়ায়। সুশীলার কাছে তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ মিথ্যে মনে হলো কেন, তা বুঝে ওঠা কঠিন। সুশীলা যদি সত্যিই বিধবা হয়ে থাকে তবে তার মনে স্বামীর প্রত্যাগমন আশা করা যুক্তি সঙ্গত বলে মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। আবার, যদি স্বামীর মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে তার সন্দেহই থেকে থাকে তাহলে সে বিধবা হয়ে ছিলই বা কেন - এ নাটকে এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই। কাদম্বিনী যখন সুশীলাকে বলেছে -

> "তোমার দুঃখের অবসান হয়েছে, জগদীশ তোমার মনস্কামনাপূর্ণ করবেন।"

তখন সুশীলা বলে,

'কেন মা তুমি আশা দাও ? আমি পাগলিনী । আমি আশায় প্রাণ ধরে আছি, আজও আমি একবার মনে করিনি, আমার স্বামী নেই, আজও আমি স্বামীর অকল্যাণ ভয়ে চুলের আগায় চিরুণী ঠেকাই, আজও কপালে খড়কে ক'রে সিঁদুর ছোঁয়াই, আজও একাদশীর দিন লুকিয়ে মাছের আঁশ দাঁতে কেটে ফেলে দিই, কে জানে কেন, আমার মনে হয় স্বামী বেঁচে আছেন । আমার মনে হয়, সংসার তাড়নায়, বাপের অযত্নে, তিনি মরা খবর দিয়ে কোথায় লুকিয়ে আছেন, ..." ৫।২ গর্ভাঙ্ক ।

মাত্র পনেরো দিনের স্বামী সান্নিধ্যে সুশীলার যে পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্য দেখি, বাস্তবতার বিচারে তা কিছু অস্বাভাবিক বলেই আমাদের ধারণা । শুধু মনের ধারণায় একজন বিধবার পক্ষে এমন আচরণ যুক্তিসঙ্গত ও প্রত্যাশিত কিনা, ভেবে দেখা দরকার । ~~~~ বিরোদবাসিনী র আচরণের যৌক্তিকতা সুশীলায় অনুপস্থিত ।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র বিরচিত 'বুড়ো বাঁদর'(১৮৭৩) প্রহসনের পরিণতি 'নীলাবতী'র পরিণতিকে স্মরণ করায় । ঘাড়েঁশুরের ছোট গিন্নী পুঁটে পর পুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে বলে যে জটিলতার উদ্ভব হয় তার সমাধান হল একথা জেনে যে, পুঁটে অসতী নয়, সে যে পুরুষটির সঙ্গে রাত কাটিয়েছে সে আসলে পুরুষ নয়, নারী, হরিদাসের বোন নলিনীর ননদ হরিদাসী ।

...

(৭)

'জামাইবারিকে'র পর্যালোচনাকে কেন্দ্র করে তার ~~~~ দুই স্ত্রী বিন্দু ও বগলার বিবাদ-বিসংবাদ ঐ প্রহসনের সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য বিষয় । রামনারায়ণ তর্করত্ন 'উভয় সংকট'(১২৭৬) প্রহসনে ঐ ঘটনাটি অবলম্বন করে কাহিনী-সূত্র বয়ন করেছেন । মাত্র চারটি চরিত্রের সমবায়ে গঠিত এই প্রহসনে কর্তাকে কেন্দ্র করে বড় গিন্নী ও ছোট গিন্নীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব বেশ জমাট বেঁধে উঠেছে । বগলা ও বিন্দুর মতই বড়গিন্নী ও ছোটগিন্নীর মধ্যে

কর্তার ঝা খাওয়ার ব্যাপারে উভয়ের প্রতিযোগিতা এবং পা টেপার ব্যাপারে ডান পা ও বাঁ পায়ের স্বত্ত্ব স্বামিত্ব নিয়ে ঝগড়া বেঁধেছে। দুই স্ত্রীর ঝগড়ার চাপা কেন যেমন পদ্মলোচনের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল এখানেও বড় ও ছোট গিন্নীর পতিসেবার জ্বালায় কর্তার প্রায় জরাসন্ধ বধ হওয়ার জোগাড়। তবে দুঃশীলা রমণীর প্রভাবে পুরুষের দুঃখ দুর্দশার স্বরূপ বর্ণনা ও তাদের স্বভাব পরিবর্তন হলে পুরুষের যে স্ত্রীর সুখানুভব - দীনবন্ধুর জামাই বারিকের এই ব্যঞ্জনা এখানে লক্ষণীয় নয়। দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক প্রহসনের মতই এই প্রহসনের আলোচ্য বিষয়টির বহিরঙ্গ কৌতুক রসকেই পরবর্তী নাট্যকারগণ অনুকরণ বা অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। প্রচ্ছন্নিহিত মানব সমস্যাটি তাঁরা তাঁদের রচনায় যথাযথ পরিস্ফুট করতে পারেন নি।

রাধাবিনোদ হালদারের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'(১৮৮৫) প্রহসনের একটি দৃশ্য ভজহরির দুই স্ত্রী সুহাসিনী ও চারুশীলার দ্বন্দ্ব বেশ প্রাণবন্তরূপ লাভ করেছে। মহিলা মহলের ঝগড়া বিবাদের প্রধান হাতিয়ার তাদের মুখের ভাষা। বঙ্গলা ও বিদুষাসিনীর বিবাদের ভাষা তারই তুলনায় দুষ্টু। রামনারায়ণ এই বিবাদের ভাষা সৃষ্টি করতে পারেন নি। এ বিষয়ে রাধাবিনোদ কিছু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যেমন,

সুহাসিনী - "ও মাগো, যেন বাবা-কেনে ভাতার পেয়েছিস্, আর কি।"

কিংবা - "আমি আগে ঔষধটা খেয়ে তোটা তোকে দিয়েছিলুম, তবে তুই পেয়েছিস্।"

চারু - হাঁ, তুমি পেট থেকে দিয়েছ কিনা, তাই পেয়েছি।"

কিংবা - (সুহাসিনীর উদ্দেশ্যে) সে আসুক, মায়ের মত যত্ন করে (ভজহরিকে) খাওয়াবে।

সুহাসিনী - মেয়ের মতন(চারুই বরং) কাছে বসে বাতাস করবে।"

দুই অঙ্কের বিবাদের জ্বালায় উক্ত ভজহরির উপলব্ধি -

"এমন জানলে কোন্ শালা দুটো বিয়ে করে, সাতজন্ম যদি ছেলে না হয় তবুও যেন এমন কুকর্ম কেউ কখন করে না।" - পদ্মলোচনের দুরবস্থাকেই স্মরণ করায়।

'জামাই বারিকে'র দুই সপত্নীর কোন্দল প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়'(১৩৪৫) প্রহসনে অনুসৃত হয়েছিল বলে মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। পদ্মলোচন তার দুই স্ত্রীর অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পালিয়ে বাঁচে। 'মুক্তির উপায়' প্রহসনেও মাখনের দুই স্ত্রীর অত্যাচার মাখনকে গৃহছাড়া করেছে। বগলা ও বিন্দুবাসিনী এক চোরকে পদ্মলোচন ভ্রমে যেভাবে প্রস্তুত ও লাঞ্ছিত করেছে, এক ফকিরকে নিজেদের স্বামী মনে করে মাখনের দুই স্ত্রী অনুরূপ টানাটানি করেছে। অবশেষে, উভয় নাটকেই প্রকৃত স্বামীর আগমনে ভুল সংশোধন হয়েছে। উভয় নাটকেই পরিণতিতে সপত্নীদের স্বভাব পরিবর্তন ঘটেছে।

কিন্তু দুটি প্রহসনেই এই সপত্নী দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটি রূপে এক হলেও রসের দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। বগলা ও বিন্দুবাসিনীর শানিত বাক্যছটা, কথাকে শ্লেষ ও ব্যঙ্গময় করতে প্রেমাত্মক প্রবাদ ব্যবহার, সর্বোপরি তাদের গালাগালির ভাষা অতি প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত। কিন্তু এই দুই স্ত্রীর ভাষায় কোন বিশেষত্ব কেউ খুঁজে পাবেন না। নাটকীয় চরিত্রকে চিনে নেবার একটি মাত্র পথই আছে - সে তার মুখের ভাষা। এই মুখের ভাষার বিশেষত্বেই কাউকে আমরা রাজা বলে চিনতে পারি, কাউকে বা প্রজা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকে এ জাতীয় চরিত্রনির্ণায়ক সংলাপ খুব সুলভ নয়। ছোট বড়, রাজা-প্রজা, অধ্যাপক-ভৃত্য সকলেরই মুখের ভাষা রাবীন্দ্রিক। দীনবন্ধুর যেখানে সিদ্ধি রবীন্দ্রনাথের সেখানে সাধ্যতা। রামনারায়ণের 'নব নাটকে'র তৃতীয় অংকে চিত্তবিনোদের সংলাপে চোরের জবানবন্দীতে যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে তা হুবহু 'জামাই বারিকে'র চোরকে নিয়ে বগলা ও বিন্দুবাসিনীর ভ্রমাত্মক টানাটানির বর্ণনা। পদ্মলোচনের জন্য চোরের সহানুভূতির সাদৃশ্যও 'নব নাটকে'র চোরের জবানীতে আছে, -

> "আমার দুঃখ হতে লাগলো, বলি আমি না হয় গিয়ে ভাল মানুষের ছেলেকে ছাড়িয়ে দি, তা আমি যে চোর, ছাড়িয়ে দিতে গেলে যে ধরা পড়বো। তা কি করি, অমনি চুপ করেই থাকতে হলো, পালাতেও অবকাশ পেলাম না। রাত্রি পুইয়ে গেলে অমনি ধরা পড়িছি, তাই নিবেদন করলেম, আমাকে যে সাজা দিতে হয়

দিন, কিন্তু দুটো বিয়ে দেবেন না, তার চেয়ে মজা আর পৃথিবীতে নাই।"

...

(৮)

অতি আধুনিক কালের গণ নাটকের নাট্যকারগণ তাঁদের নাটকের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন 'নীলদর্পণ' থেকেই। শতবর্ষ আগে যে নাটক একটি সামাজিক সমস্যাকে রূপায়িত করে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, আজও সেই নাটক সমাজ সমস্যামূলক নাটকের আদর্শ হয়ে আছে। বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, মনোরঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখ নব যুগের মুখ্য নব নাট্যকারগণ প্রায় সকলেই দীনবন্ধুর নাটকের কালজয়ী আবেদনকে স্বীকার করেছেন অতি সশ্রদ্ধ মনে। একথার সত্যতা উপলব্ধি করি তাঁদের নাটকের সঙ্গে 'নীলদর্পণে'র ভাবাত্মক একতায়। উদাহরণস্বরূপ দুটি নাটক আমরা এখানে গ্রহণ করছি। তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' ও মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আমার মাটি' নাটক দুটির উপর 'নীলদর্পণে'র প্রভাব আলোচনা করে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করবো।

১৩৫০ এর বাংলার মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত 'দুঃখীর ইমান' সমকালীন দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামবাংলার জীবন্ত চিত্র। নাটকটি স্পষ্টতঃই উদ্দেশ্যমূলক। এ প্রসঙ্গে তুলসী লাহিড়ী নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন -

> "ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম পরিণতি মন্বন্তরের দিনে এই চিরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাতের দল, যারা ধন-লোলুপ লোভের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল তাদের ছবি আঁকতেই এই নাটকের সৃষ্টি।"

- নাট্যকারের এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহজেই 'নীলদর্পণ' নাটক রচনার উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নীলকরের অত্যাচারে প্রপীড়িত গ্রামবাসীর দুঃখদুর্দশার নাট্যকাব্য 'নীলদর্পণ'। একই আদর্শে নাট্যকার তুলসী লাহিড়ি শোষণবাদী ধনতান্ত্রিক সভ্যতার যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া নিরন্ন কৃষক সাধারণের ফরিয়াদকে বাণীবদ্ধ করেছেন 'দুঃখীর ইমান' নাটকে। 'নীলদর্পণে'র মতই বাংলা দেশের একটি বিশিষ্ট অঞ্চলকে ভিত্তি করে(উত্তরবঙ্গ, রঙপুর) তিনি নাটকীয় আখ্যানবস্তু পরিকল্পনা করেছেন।

নীলকরের প্রবল পীড়নের মধ্যেও দীনবন্ধু যেমন মনুষ্যত্বের আদর্শ ও মহত্ত্বের চিত্র তাঁর নাটকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, তেমনি 'দুঃখীর ইমানে""বাংলার দুর্ভিক্ষ মহামারী বাস্তুত্যাগের দুর্যোগের মধ্যেও .... মনুষ্যত্বের চকিত দীপ্তি কোন কোন মুহূর্তে(নাটকীয় পঙ্‌ক্তি পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে) প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল।" ১১ নাট্যকার সম্ভবত পঙ্‌ক্তি পঙ্‌ক্তি নির্বাচনের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন 'নীলদর্পণ' থেকেই। দুঃখের কোন জাতি ভেদ নেই। নির্যাতনের জাঁতাকলে হিন্দু মুসলমান সকলেই যখন নিষ্পেষিত হতে হয় তখন সংকীর্ণ জাতি ভেদ দূরীভূত হয়- সর্ব সংস্কার মুক্ত মনুষ্যত্ব চেতনার উদ্বোধন ঘটে তখন। তোরাপ তাই নবী নয়াধরের জন্য প্রাণপণ করে। নীলকরের কুঠীতে বসে তোরাপের সঙ্গে অন্যান্য হিন্দু রাইয়তদের কথাবার্তায় পারস্পরিক সমবেদনার সুর ধ্বনিত হয়।

'দুঃখীর ইমান' নাটকে জামান ও ধর্মদাস দুটি ভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত হলেও তারা একই দুঃখে দুঃখী। জামানের দুঃখ ধর্মদাসের বুকে বাজে। জামানের দুঃখে ধর্মদাস বিপজ্জনক দুঃসাহসিকতার কাজ করতেও পিছপা হয় না। কঠিন শাস্তির কথা জেনেও জামান তার 'ইমান' বিসর্জন দিয়ে ধর্মদাসের অপরাধ কবুল করে না। ধর্মদাস জামানের ইমানদারিতে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বীয় অপরাধ নিজ মুখে স্বীকার করেছে। দুঃখী জামান ও ধর্মদাসের ইমান কিন্তু ততক্ষণে অনেকের সুপ্ত মনুষ্যত্বকেই জাগিয়ে তুলেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই 'দুঃখীর ইমান' রচিত। অবশ্য 'নীলদর্পণে'র শৈল্পিক সিদ্ধি এ নাটকে নেই। একথা স্বীকার না করে পারা যায় না।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের বাংলাদেশে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রথার অবসান ঘটিয়েছে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক অর্থ-লোলুপতা ও সর্বগ্রাসীর মনোভাবের প্রকাশ্য সংঘটন বন্ধ হলেও আইনের ফাঁকে অথবা ছলে বলে তাই আরও ভীষণ আকারে বাংলার কৃষক জীবনকে নিদারুণ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিল। এই সময়কার কৃষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত মনোরঞ্জনের মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আমার মাটি' নাটক।

'নীলদর্পণে'র মতই এই নাটকের উপস্থাপ্য অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের দ্বন্দ্ব। খোলকবুকে ভিটে মাটি ছাড়া করতে চেয়েছিল নীলকর সাহেবেরা।

নবীনমাধব নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু অত্যাচারী নীলকরদের বিষাক্ত দংশন জ্বালায় এই পরিবার ওলে পুড়ে মরতে বাধ্য হয়েছে। নারী লোলুপতার শিকার হতে হয়েছিল ক্ষেত্রমণিকে। 'নীলদর্পণ' নাটকের এই কাঠামোটি 'আমার মাটি' নাটকের অবয়বে নবরূপে পুষ্ট হয়েছে। 'দুঃখীর ইমানে'র মতই এই নাটকের পরিণতি আশা-ব্যঞ্জক। ফলশ্রুতির এই পার্থক্য টুকু নাটকদুটির লক্ষণীয় বিশেষত্ব। কিন্তু অবয়বে নীলদর্পণের ছাপ সুস্পষ্ট।

হাজারী মণ্ডলের উপর জোতদার রতন বিশ্বাসের বিরাগ। জমিজমা, বাস্তুভিটা থেকে হাজারীকে উচ্ছেদ করবার যে চক্রান্ত এবং সেজন্যে মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করবার চেষ্টা 'নীলদর্পণে'র ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়। নাটকের প্রথম দৃশ্যে হাজারীর উক্তি -

"..... শালারা যে মতলব এঁটেছে - তা পিরাণে আর কাউরি থাকতি দেবে না দেকচি -" গোলকবসুর - "পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার করিতে দেন, এমত বোধ হয় না।" (১।১) -

উক্তিকে মনে করিয়ে দেয়। বৃন্দাবনের আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাবের সঙ্গে নবীন মাধবের সংগ্রামী মনোভাবের সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। নীলকরের নারী লোলুপতার কথা দীনবন্ধু ব্যক্ত করেছেন আমীনের মুখে এবং তাও গভর্নর রোগসাহেব কর্তৃক ক্ষেত্রমণির রূপমুগ্ধ লম্পটতার প্রসঙ্গ অবতারণা করে। নাট্যকার মনোরঞ্জন বিশ্বাস তাঁর নাটকে রতন বিশ্বাস-এর এ জাতীয় হীনতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন যমুনার জন্য তার পাশবিক চক্রান্তের অবতারণা করে।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে হয়, হাজারী কিন্তু পুরুষ মানুষ হয়ে, পিতা হয়ে জমি জমা ঘর বাড়ির জন্য কন্যা বিক্রি করে ফেলেছিল, কিন্তু সামান্য গ্রাম্য কৃষক রমণী রেবতী কোন প্রলোভনেই ক্ষেত্রমণিকে বেচে দিতে চায় নি। একি শুধু নাটকীয় দুটি চরিত্রের বৈসাদৃশ্য, নাকি নাট্যকার-দুয়ের জীবনদর্শনেরই বৈপরীত্য ?

এই পরিচ্ছেদে দীনবন্ধু-পরবর্তী মুষ্টিমেয় কয়েকটি নাটকের উপর দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করা হল। ব্যাপক অনুসন্ধান ও গভীরতর বিচারে আরও অনেক নাটকেই দীনবন্ধুর নাটকের অনুরূপ আদর্শ, চরিত্র ও সংলাপাংশের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব বলে মনে করি।

.....

।। সূত্র - নির্দেশ ।।

১। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড: ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ - ৮৪১ ।

২। রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : অপরেশ মুখোপাধ্যায়, পৃ - ৪১ ।

৩। গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড : গিরিশচন্দ্র ঘোষ, "সাহিত্য সাধনা" - ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য । সংবদ সংস্করণ, পৃ - ৬৬ ।

৪। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ - ২৬১ ।

৫। " In the mind of the Elizabethans, the connection between murder or suicide and Tragedy was so definitely established that for Shakespeare and his companions the two almost become synonymous." The Theatre and Dramatic Theory, A.Nicoll.

৬। "দীনবন্ধুর 'আদুরী' চরিত্রের সমগোত্রীয় চরিত্র বাংলা নাট্য সাহিত্যে পরবর্তী কালে সৃষ্ট হইয়াছে । দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকে 'রেবার' ধাত্রী এই জাতীয় চরিত্র ।" - বাংলা সাহিত্যে লঘু নাট্যের ধারা : ডঃ ত্রৈবদ্য নাথ শীল, পৃ - ৭১ ।

৭। "একদিন মেজ বৌ-ঠাকুরাণী আমায় বলিলেন - অনেকদিন তুমি নাটক রচনা কর নাই - একখানা নাটক এইখানে লিখে ফেল । আমি বলিলাম - এখন আমার মাথায় কোন প্লট নাই, লেখা হইবে না । তিনি শুনিলেন না, জবরদস্তি আমাকে একটা ঘরে পুরিয়া, তারক দাদার (সার ললিতের) কন্যা শীলুকে আমার পাহারায় নিযুক্ত করিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন । যতক্ষণ নাটক না লেখা হইবে, ততক্ষণ আর আমার মুক্তি নাই । দায়ে পড়িয়া এই রূপে 'হিতে বিপরীত' রচিত হইল ।" - জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবনস্মৃতি ।

৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ২য় খণ্ড : ডঃ সুকুমার সেন, পৃ - ২৬৩।

৯। বাংলা সাহিত্যে লঘু নাট্যের ধারা : ডঃ বৈদ্যনাথ শীল, পৃ - ২৩৫।

১০। "দুলাল একটি অস্বাভাবিক চরিত্র - দীনবন্ধুর নিমচাঁদের কি ক্ষীণ ছায়া মাত্র।"
- বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃ - ২৬১।

১১। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড : ডঃ আশুতোষ - ভট্টাচার্য, পৃ - ৪৬৭।

.....